লোক-সাংবাদিকতা ঃ লোকসঙ্গীত



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা



প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী, ১৫ মাঘ, ১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শঙ্কর প্রসাদ নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১-ই, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

গণসংযোগ, গণ-মাধ্যম ও লোকসাংবাদিকতা

"গণ' বলতে বোঝায় বৃহত্তম জনসমষ্টি। তারা বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রান্তের অধিবাসী। পরস্পরের কাছে অপরিচিত এবং একই সঙ্গে একই উদ্দীপকের সম্মুখীন হলেও তাদের প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন ভিন্ন।

"টমাস ফোরড হোলট (Thomas Ford Holt) বলেছেন :

"A mass is not simply a lot of people, but relatively large number of persons, spatially dispersed and anonymous reacting to one or more of the same stimuli but acting individually without regard for one another.

"এ হেন যে জনসমষ্টি তাদের উদ্দেশে রচিত এবং গণমাধ্যমের (mass media) মধ্য দিয়ে পরিবেশিত জ্ঞাপন পদ্ধতিকে বলে গণজ্ঞাপন। এক কথায় গণজ্ঞাপন গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জ্ঞাপন পদ্ধতি (mass mediated communication)।"[১]

গণ-সংযোগের বা গণজ্ঞাপনের মূল সূত্র হল তথ্য বিনিময়। এই তথ্য বিনিময় বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, যেমন কোন ঘটনার বিবরণ, জনগণের উপর শোষণের চিত্র, অনাচার ও দুর্নীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র, সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্রীয় রাজনীতির কূট কৌশলে জনগণের অসুবিধা বা আধুনিক অবস্থার কুফল ইত্যাদি নানা বিষয়েই তথ্য পরিবেশিত হতে পারে। এই তথ্য প্রচার করতে হয় এমন ভাবে যা জনগণের উপর স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং তথ্য সম্প্রচারের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই তথ্য সর্বজনগ্রাহ্যতার অন্যতম মাপকাঠি হল তথ্য সরবরাহের মাধ্যম নির্বাচন। যাদের কাছে এই তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে—তাদের মতো করে তথ্য সরবরাহ করতে হবে, এর ফলে যে মাধ্যমকে জনগণ আপন ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে সেই গণমাধ্যমেরই গুরুত্ব বেশি। তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন তথ্যের বোধগম্যতা; অর্থাৎ যে ভাষায় ও

১। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—গণ-জ্ঞাপন, ১৯৮২। পৃঃ ৪২

প্রক্রিয়ায় পরিবেশিত হলে তথ্য জনগণের কাছে সহজ বোধগম্য হয়, সেই ভাষা ও পন্থা অনুসরণ না করলে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না।

গণসংযোগ বা গণজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে মাধ্যমের দ্বারা জনগণের কাছে তথ্য সরবরাহ করা হয় তাইই গণমাধ্যম। আরও বিশদ করে বলতে হয় যার মাধ্যমে জনগণের নিকট নির্দিষ্ট তথ্য ও বার্তা পৌঁছে দিয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি করা যায় তাইই প্রকৃষ্ট গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের মূলতঃ তিনটি ভাগ—১—মুদ্রিত মাধ্যম (Print Media) অর্থাৎ যাবতীয় পুস্তক, সংবাদপত্র, চিত্র, সাময়িক পত্র, প্রচার পত্র, হোর্ডিং ইত্যাদি। ২—যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিন মাধ্যম (Electronic Media) যার মধ্যে রয়েছে রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, রেকর্ড প্লেয়ার, চলচ্চিত্র, ভিডিও রেকর্ডিং ও সর্বশেষ কম্পিউটার প্রভৃতি এবং ৩—মৌখিক মাধ্যম (Oral media) —এর মধ্যে রয়েছে কথোপকথন, কথকতা, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্যগীত ইত্যাদি। তিনটি পর্যায়ের গণমাধ্যমকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়—একটি প্রথাসিদ্ধ গণমাধ্যম (Traditional Mass Media) যা মৌখিক গণমাধ্যমের পর্যায়-ভুক্ত, অন্যটি আরোপিত গণমাধ্যম (Adopted Mass Media) অর্থাৎ মুদ্রিত মাধ্যম ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অন্তর্গত বিষয়সমূহ।

প্রথাসিদ্ধ গণমাধ্যম এমনই এক ধারা যা সভ্যতার প্রথম অবস্থা থেকেই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলে আসছে, মানুষের ভাব বিনিময়ের সময় থেকেই। এই গণমাধ্যমের জন্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং সর্বকালের মানুষই একে লালন ও পালন করে এসেছে, স্বভাবতঃই গণসংযোগের ক্ষেত্রে অন্য সব মাধ্যমকে অতিক্রম করে এই প্রথাসিদ্ধ গণমাধ্যমই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও আরোপিত গণমাধ্যমের চমকদারীর বিচারে তা নিতান্তই ম্লান। আদিম যুগ থেকে অদ্যাবধি মানুষ যতই উন্নতির পথে এগিয়েছে তার ভাব বিনিময়ের মাধ্যমগুলিও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে কৌম সমাজ, পরবর্তী ধাপে লোকায়ত সমাজ এবং সবশেষে উন্নততর আধুনিক শ্রেণী বিভক্ত সমাজে উত্তরণের প্রতিটি ধাপেই ভাব বিনিময়ের মাধ্যমেরও পরিবর্তন হয়েছে, নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে গণসংযোগের মাধ্যমগুলি আরও পরিশীলিত (Sophisticated) হয়েছে, কিন্তু মূল যে

লৌকিক মাধ্যম তার কোন চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেনি; যা ঘটেছে তা কেবল তার রূপের পরিবর্তন।

"এক সময়ে দেবতার কল্পনা করে তার উদ্দেশে নিজেদের ভক্তি, ভয়, স্তুতি-ইত্যাদি নিবেদন করাটা ছিল এক ধরণের কম্যুনিকেশন। এর থেকেই এসেছে নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, মন্ত্র, কাহিনী। কালের পাতা যতই উল্টেছে, এদের ভিতর সূক্ষ্ম-জটিল ব্যঞ্জনা আরোপ করে ভাবপ্রকাশের ক্রমান্বিত পরিশীলন করা হয়েছে। নাচের একটা ভঙ্গী, একটা বিশেষ অর্থবহন করতে আরম্ভ করেছে হয়ত; কালক্রমে সেই ভঙ্গী বা মুদ্রাটিই একটা ভাব-সঞ্চারের মাধ্যমে পরিণত হল। একটা বাস্তবানুগ চিত্ররেখা উত্তরকালে বিশেষ কোনো তাৎপর্য-দ্যোতক চিহ্নে বিবর্তিত হল; একটা বিশিষ্ট ধ্বনির ব্যঞ্জনা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। যা ছিল দেবতার উদ্দেশে গোষ্ঠীর প্রতিবেদন, তাই পরিবর্তিত হয়ে গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনীন সঞ্চারণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য হতে লাগল।"[১]

অবশ্য জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলেও প্রথাসিদ্ধ গণমাধ্যম আরোপিত গণমাধ্যমগুলির বিরোধী কোন মাধ্যম নয়, জীবনযাত্রার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরোপিত বা আধুনিক বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমের সঙ্গে প্রথাসিদ্ধ গণমাধ্যম গভীর সম্পর্কযুক্ত। এ যুগের প্রথাসিদ্ধ গণসংযোগকারী যেমন—কবিয়াল, বাউল, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও ব্যাপকার্থে লোকসঙ্গীত শিল্পীগণ আধুনিক বা আরোপিত মাধ্যম থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে অনেক সময় তথ্য পরিবেশন করেন। জাপানের চীন আগ্রাসন বা জার্মানীর হিটলার কর্তৃক সুদাতেন অধিগ্রহণের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া আগ্রাসনের ঘটনা বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমেই লোক কবিগণ সংগ্রহ করেছিলেন।

'শুনেন সবিশেষ একটি দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া যার নাম
ছিল রাষ্ট্র মধ্যে উন্নত সে বড়ই সুঠাম…' (সঙ্গীত নং ১১৪)

তেমনি কারবালার কাহিনীও জেনেছিলেন কোন পুস্তকের মাধ্যমে।

১। চাই না পানি ওরে আকবর যাসনে বাপ ওই রণে
ওই যে রে জল্লাদের ময়দান তুই গেলে বাপ ফিরবিনে।

(সঙ্গীত নং ১২০)

১। পল্লব সেনগুপ্ত—সংযোগ-সঞ্চারণ ও লোকসংস্কৃতি (বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগ সমস্যা; সম্পা—ক্ষেত্র গুপ্ত) ১৯৮৩। পৃঃ ৩২-৩৩

২। আকবর আলি কেঁদে বলে শোন বাজান পানি চাই
পানি বিনে আর বাঁচিনে দেল কলজে হল ছাই। (সঙ্গীত নং ১২১)

৩। বিয়ার রাইতে যুদ্ধে যাইতে ক্যান আকিঞ্চন
হে পাণোনাথ আর আমায় কান্দাইও না। (সঙ্গীত নং ১২২)

অন্যদিকে লোককবিদের গাওয়া গান, যাত্রাপালা, কীর্তন, গম্ভীরা পালা ইত্যাদি লোকমাধ্যমের অংশ-বিশেষ বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমেও প্রচারিত হয়, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তকেও স্থান পায় অর্থাৎ আরোপিত মাধ্যম ও প্রথাসিদ্ধ মাধ্যম পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত (functionally inter-related) ও সহযোগী।

এই প্রথাসিদ্ধ গণমাধ্যমে (Traditional Mass Media) রয়েছে তিনটি পর্যায়—নৃত্য, গীত ও নাটক। এই তিনের মধ্যে গীত অর্থাৎ সঙ্গীতেরও নানা ভাগ। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের (হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক সঙ্গীত শৈলী) পর্যায় বিভাগ ছাড়াও ভারতীয় সঙ্গীত মার্গ, কাব্য ও লোকসঙ্গীত এই তিন ধারায় প্রবাহিত। মার্গ ও কাব্য সঙ্গীতে শ্রোতার শ্রবণের পরিতৃপ্তি ঘটে কিন্তু এগুলির দ্বারা তথ্য পরিবেশিত হয় খুব সামান্যই, যদিও ভাব-সৌন্দর্যে তা অনবদ্য। অবশ্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও গণ-সঙ্গীতে থাকে দেশ-প্রেমের গান, থাকে গণচেতনার গান। যদিও তার প্রয়োগ অত্যন্ত কাব্যিক ঢঙে, সঙ্গীতে সুরের প্রাধান্য কথাকে ছাপিয়ে ওঠে হামেশাই। মার্গ সঙ্গীতে কথার ভূমিকা খুব সামান্যই, কেবল স্বরের সাঙ্গীতিক বিকাশেরই প্রাধান্য, অন্যদিকে কাব্য সঙ্গীতে কথার ভূমিকা থাকলেও সঙ্গীতকে কাব্য-সুষমা মণ্ডিত করে তোলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ফলে তথ্য-পরিবেশনের দিকটি অবহেলিতই থাকে। কাব্য সঙ্গীতে সুর আর বাণীর মেল-বন্ধন ঘটিয়ে সঙ্গীতকে মনোরঞ্জনকর ও রসোত্তীর্ণ করে তোলার দিকেই সঙ্গীতকারদের অধিক দৃষ্টি থাকে, ফলে এগুলি মূলতঃ হয়ে ওঠে বিনোদন-মূলক সঙ্গীত।

অন্যদিকে লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হয় লোক-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, লৌকিক জনগণের ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা রচিত সঙ্গীত সমষ্টির গ্রহণযোগ্যতার কষ্টিপাথরে বিচার করা হয়। এ সঙ্গীত বিনোদন-মূলক হলেও তাতে থাকে জীবনের গান, আর এই জীবনের গানের গণচেতনা বৃদ্ধির সহায়ক অংশই লোক-সাংবাদিকতার গান। মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন গণ-মাধ্যমের যে ভূমিকা, এই লোক-

সাংবাদিকতার গানের ভূমিকাও তদনুরূপ বা তার চেয়েও শক্তিশালী গণ-মাধ্যম এই লোক-সাংবাদিকতার গান।

অবশ্য সমস্ত লোকসঙ্গীতই গণমাধ্যমের কার্য সাধন করে না, যে সমস্ত লোকসঙ্গীত গণচেতনা বৃদ্ধি করে এবং তথ্য-পরিবেশন ক'রে গণমাধ্যমের দায়িত্ব পালন করে, কেবল সেগুলিকেই লোক-সাংবাদিকতার আওতাভুক্ত করা হয়। 'লোক-সাংবাদিকতা' শব্দটি অদ্যাবধি বহুল প্রচলিত নয়। 'সাংবাদিকতা' আছে, 'লোকসাহিত্য' আছে কিন্তু লোকসঙ্গীতে সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে, কারণ এদিকে প্রথম ও একমাত্র আলোকপাত ইতিপূর্বে করেছেন ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'লোক-সাংবাদিকতা ও জন-সংযোগ' শীর্ষক প্রবন্ধে। তাঁর মতে, "লিখিত সাংবাদিকতা আরম্ভ হবার অনেক আগেই, বিশ্বের প্রায় সব দেশের লোকসাহিত্যেই মৌখিক সাংবাদিকতা (Oral journalism) শুরু হয়ে গিয়েছিল। একেই এক বিশেষ অর্থে 'লোক-সাংবাদিকতা' (folk journalism) আখ্যা দিচ্ছি। 'বিশেষ অর্থে' এই জন্যে বললাম, 'লোক-সাংবাদিকতা' লোক-সাহিত্যেরই একটি অঙ্গ, এবং ইদানীং লিখিতরূপেও লোক-সাহিত্য মিলছে।

"সাংবাদিকতা তা সে লিখিতই হোক, আর মৌখিকই হোক, তার, মূল লক্ষ্য হল—Communication অর্থাৎ জনসংযোগ—সংবাদকে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সেই জনতাকে একটি লক্ষ্যের প্রতি চালনা করা বা তাদের সচেতন করে তোলা।"[১]

লোকসঙ্গীতের এই বিশেষ দিকটিই লোক-সাংবাদিকতার অঙ্গ। লোক-সঙ্গীতে যে 'সালতামামি' বা বার্ষিক বিবরণীর মত পালা গান প্রচারিত হয় সেগুলিও লোক-সাংবাদিকতার পর্যায় বিশেষ। চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে মালদহের গম্ভীরা গান বা রাঢ়বঙ্গের গাজনের গানে এই সালতামামির নমুনা পাওয়া যায়। চোর চুরনী বা চক-চুন্নী, মেচেনী, ভাদু, টুসু, ঘেঁটু সব ধরণের গানেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈসর্গিক ও বাস্তব ঘটনাই গানের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত।

"ব্যক্তিই ছিল ইহাদের উপজীব্য। কচিৎ কখনও সমাজের কথাও ইহাদের

১। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক—লোক-সাংবাদিকতা ও জন-সংযোগ (বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগ সমস্যা, সম্পা—ক্ষত্র গুপ্ত) ১৯৮৩। পৃঃ ১৩৭

আলোচনার বিষয়ীভূত হইত। কিন্তু তাহার ফলে পল্লীগ্রামে এক সম্প্রদায়ের গায়কের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাহারা বৎসরান্তে সারা গ্রামের 'সালতামামি' গাহিত। এই জাতীয় গানের নাম ঘেঁটু। বীরভূম, বর্ধমানের দূর পল্লীতে আজিও এ গানের লুপ্তাবশেষ খুঁজিলে মিলিতে পারে।"[১]

অর্থাৎ জনসমাজকে সংবাদ পরিবেশন এবং তদনুযায়ী জনগণকে সজাগ করার কাজ করা হচ্ছে এইসব লোকসঙ্গীতে। বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন তৎকালের মানভূম ও পুরুলিয়ার টুসু গানের লোক কবিরা।

মানভূমের টুসু গান—

'মোরা বেঁচে আছি আশাতে—
বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে…' (সঙ্গীত নং ৩২)

পুরুলিয়ার টুসু গানের একটি নমুনা—

'শুনরে বিহারী ভাই—
তুরা রাখতে লারবি ডাং দেখাই'·· (সঙ্গীত নং ৩৩)

বছরের নানা ঘটনার সালতামামি ছাড়াও বিভিন্ন অনাচারের ক্ষেত্রে তার বিচারের ভারও এই লোক-কবিরা দিয়েছেন জনগণের হাতে।

টুসু গানের মত ভাদু গানেও রাজনৈতিক অব্যবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে কোনও কোনও সময়। রাজনৈতিক ডামাডোলের শিকার হয়ে আদিবাসীদের জীবনও হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ। তাই ভাদুর কাছে অভিযোগ, তোমার চড়ক ঘোরানোর সাথে সাথে আমরাও ঘুরে মরছি, এর ফলে জীবনে আমাদের কোন দিশা ঠিক নেই—

ভাদুধন চড়ক ঘুর‍্যালো
ঘুরছি ফি সন পাকে পাকে ঠহর না মিলে।[১]
যা খুঁসী তা বল তুমি তড়াক[২] বলি হঁ,
(আমরা) ডু-ব্যাছি কি ডুবতে বাকী কায়ই জানি না।

[অর্থ সংকেত : ১—বুঝতে পারছি না, ২—তৎক্ষণাৎ।]

১। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'গৌরাঙ্গ সংস্কৃতি', জিজ্ঞাসা, ১৯৭২। 'কবির গান' প্রবন্ধ পৃঃ ১২৪-১২৫

রাখ ধরম রাখ ধরম বলে চ্যাচা[১] করাল্যেক
কী যে হবেক কে বুলবেক লাগোথ না মিলে
আধ পাগলা পাঁয়ে[২] মোদের আস্ত ডুব্যালে ॥[৩]

জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সমাজে দোল পূর্ণিমাতে নকল বিচার সভার আয়োজন করে তাতে লোককবি সাংবাদিকের ন্যায় কোন ব্যক্তি বিশেষের গুরুতর অপরাধের কাহিনী জনসমাজের সামনে পেশ করেন। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার গোবরা গ্রামে বিজয়া দশমীর দিন এই ধরণের লোক আদালতের আসর বসে। সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবির পালা গান বা পীরের গানের আসরে নানা ধরণের সংবাদ দেওয়া হয় যেমন কোন গ্রামের কাকে বাঘে নিয়েছে, কোথায় সাপের কামড়ে লোক মরেছে বা কুমিরের পেটে গেছে কোন হতভাগ্য মাছ ধরা জেলে।

এইসব সংবাদ পরিবেশিত হয় সমবেত মানুষের কাছে বা গানের আসরে। এছাড়াও নানা 'সঙ' তৈরী করে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন লোক-কবির দল। এইসব সঙে বিভিন্ন জনের অন্যায় অত্যাচারের কাহিনী বা অন্য কোন ঘটনার কথা প্রকাশ করা হয়। এক সময়ে কলকাতার 'জেলে পাড়ার সঙ', 'কাঁসারী পাড়ার সঙ' ছিল বিখ্যাত ; তাতে নানা ধরণের খবরা-খবর আদান-প্রদান করা হত। শ্লেষ ও ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ এই 'সঙ' গুলি লোক-সমাজের দর্পণ হিসাবে বিবেচিত হত।

কাঁসারী পাড়ার সঙের একটি বিখ্যাত গান

আজব শহর কল্‌কেতা
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
বলিহারি সভ্যতা।

যত বক-বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী বদমাইশের ফাঁদ পাতা
পুঁটে তেলির আশা-ছাড়ি শুঁড়ি সোনার বেণের কড়ি
খ্যামটাওয়ালীর খাসা বাড়ি ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা ॥

[অর্থ সংকেত : ১—চেঁচামেচি করাল অর্থাৎ আন্দোলন করালে, ২—পেয়ে (আধ পাগলা ভেবে), ৩—সব শুদ্ধ ডুবিয়ে মারলে।

হদ্দ হেরি হিঁদুয়ানী ভিতর ভাঙা ভড়ংখানি
পথে হেগে চোখ রাঙানি লুকোচুরির ফের গাঁথা
গিল্‌টি কাজে পালিশ করা রাঙ্গা টাকা তামা ভরা
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে তফাৎ থাকাই সারকথা ॥

—'হুতোমের নকসা' থেকে

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার 'চোর-চুরনীর গান বা চক-চুন্নীর পালা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার 'বোলান' গান, পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের 'টাঁড় ঝুমুর' প্রভৃতি গানে এই ধরণের লোক-সাংবাদিকতার সন্ধান মেলে।

গণ-সংযোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জনগণের সঙ্গে গণ-মাধ্যমের সাযুজ্য সৃষ্টি করা। বিখ্যাত জ্ঞাপন-বিশারদ Wilbur Schramm বলেছেন, "When we Communicate we are trying to establish a **Commonness** with some one. That is, we are trying to share information an idea or an attitude". এই Commonness হল গণ-সংযোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পারস্পরিক সাযুজ্য না থাকলে জনসংযোগ সার্থক বা সম্পূর্ণ হয়না। গণসংযোগের সার্থকতা নির্ভর করে গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতার উপরেও। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম জনসমাজের যত কাছের হবে বা যত সহজে তার নিকটবর্তী হওয়া যাবে, ততই লোকের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে। এই সম্পর্কে লোক-কবিদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকের চেয়ে বেশি কারণ প্রথমতঃ এই লোক-কবির দল জনগণের সাযুজ্য লাভ করে অর্থাৎ এরা জনগণের অনেক কাছের মানুষ, দ্বিতীয়তঃ এদের কাছে ঘটনা যাচাইয়ের সুবিধা অনেক বেশি তাই গুজবের চেয়ে চাক্ষুষ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় এবং তথ্য পরিবেশনে এদের আপাত কোন স্বার্থ জড়িত থাকে না।

লোক শিল্পীরা জনসমাজের নিজস্ব লোক, এঁরা জনগণের ভাষাতেই কাহিনী ব্যক্ত করেন। উপরন্তু কাহিনীর বর্ণনায় লোকশিল্পীগণ নিরপেক্ষ বা স্বার্থশূন্য হয়ে ঘটনার বিশ্লেষণ করেন—ফলে লোকশিল্পীদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বিজ্ঞাপনের ভাষা ও তার প্রচারে থাকে নানা চটক, কিন্তু যাঁরা সংবাদপত্রে ও হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপন পড়েন বা দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন দেখেন কিংবা বেতারে বিজ্ঞাপন শোনেন তাঁরা জানেন বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পণ্য-বিক্রয় করা, স্বভাবতই বিজ্ঞাপন যতই চটকদার হোক না কেন তার

বক্তব্য বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। অন্যদিকে লোককবিদের প্রচারে বা তথ্য-সরবরাহে লোক-কবির কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ থাকেনা ফলে তার পরিবেশিত ঘটনা বা তথ্য সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হয়। গণসংযোগ বা গণ-জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসযোগ্যতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোক-কবিদের বিশ্বাসযোগ্যতা সেক্ষেত্রে বেশি কারণ তাঁরা ঘটনার সাক্ষী থাকেন বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে ঘটনা ব্যক্ত করেন না।

গণ-সংযোগের ক্ষেত্রে লোক-শিল্পীদের একক ও সরাসরি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের গুরুত্বও অনেক। একক গণ-সংযোগকারী হিসাবে জনগণের সঙ্গে এঁদের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে এবং শ্রোতা ও দর্শককুলের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা সম্ভব হয়। ফলে কোন সংবাদের গুরুত্ব জনসমাজের কাছে কতখানি সেই সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করা যায় জনগণের এই প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী পরবর্তী কর্মসূচী নেওয়া যায় বা প্রয়োজনে এই গণ-সংযোগের ধারায় পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু অন্য কোন গণ-মাধ্যমের দ্বারা এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা কষ্ট-সাধ্য এবং তার ফলে উদ্দিষ্ট ফল লাভেও বিলম্ব ঘটে এবং কার্যত গণ-সংযোগ সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। এই গণ-চেতনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না জানলে প্রকৃত গণ-সংযোগ সম্পূর্ণ হয় না—কারণ গণ-সংযোগ একমুখী প্রক্রিয়া নয়, তা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া, তথ্য সরবরাহ এবং তা অধিগ্রহণ এবং তার প্রতিক্রিয়া—এই ত্রিবিধ কার্য সম্পূর্ণ হলেই গণ-সংযোগ সার্থক হয়ে ওঠে। লোক-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে লোকশিল্পীগণ যেভাবে অবস্থার পর্যালোচনা করতে পারেন, সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র প্রভৃতির দ্বারা সেই তাৎক্ষণিক অবস্থা পর্যালোচনা সম্ভব নয়, এর জন্য সময়ের প্রয়োজন।

লোক-সাংবাদিকতার আরও একটি সুবিধা যে কোন তথ্যের পুনরাবৃত্তি করতে হবে এবং প্রয়োজনে তার পুনরাবৃত্তি করা—এই অবস্থা সামাল দেওয়া লোকশিল্পীদের দ্বারাই সহজে সম্ভব। কারণ লোক-শিল্পীরাই তার কোন তথ্যের দ্বারা কোন জনসমষ্টি অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং প্রয়োজনে কোন তথ্যের পুনরাবৃত্তি কোথায় কোথায় প্রয়োজন সেই সম্পর্কে লোক-সাংবাদিকতার সুযোগ রয়েছে—যে সুযোগ অন্য গণমাধ্যমের নেই। ফলে অন্যান্য গণমাধ্যমের নিকট কোন তথ্যের পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন তা ধরা পড়ে না এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের পুনরাবৃত্তি

না করার ফলে জনসমাজের মন থেকে তা অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং কালক্রমে সেই তথ্যের আর কোন প্রতিক্রিয়াই জনগণের মধ্যে দেখা যায় না। ফলে এসব ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

সার্থক গণমাধ্যমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—পরিবেশিত তথ্যের সহজ বোধগম্যতা। যে মাধ্যমের পরিবেশিত তথ্য জনগণের বোধগম্য নয়—তা কার্যত ব্যর্থ। এইসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন গণমাধ্যমের নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, পুস্তক, হোর্ডিং ইত্যাদি মুদ্রিত মাধ্যমের বড় অসুবিধা যাঁরা নিরক্ষর (অবশ্য স্বাক্ষর অর্থে কেবল নাম সই করার চেয়েও একটু বেশি অর্থাৎ যাঁরা পড়াশোনা করতে পারেন তাঁদেরই ধরতে হবে) তাঁদের কাছে মুদ্রিত মাধ্যমের দ্বারা তথ্য প্রচার সম্পূর্ণ অর্থহীন অবশ্য যদি না তাঁরা অন্যকে দিয়ে এগুলি পড়িয়ে নেন। তেমনি যাঁরা দৃষ্টিহীন তাঁদের ক্ষেত্রেও মুদ্রিত মাধ্যম তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের কাছে দূরদর্শনের কোন অনুষ্ঠানও খুব একটা অর্থবহ হয় না, কেবল শব্দ-শোনা ছাড়া। বেতারেও বধিরদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। স্বভাবতই প্রথাসিদ্ধ গণমাধ্যমই এইসব ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহে উপযুক্ত মাধ্যম। লোকশিল্পী তাঁর গানে এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গীর মাধ্যমে তাঁর পরিবেশিত তথ্য সকল সম্প্রদায়ের জনগণের কাছে বোধগম্য করে তুলতে পারেন।

লোকসঙ্গীতের তথা লোকশিল্পীদের এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকারী প্রচার সংস্থা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে আপন আপন বক্তব্য জনগণের মধ্যে প্রচাবের ব্যবস্থা করেন কিন্তু যেহেতু এই তথ্য প্রচারের পিছনে কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তাই ক্রমে ক্রমে এই গণমাধ্যমের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, কিন্তু যেসব তথ্য লোকশিল্পীগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রচার করেন সেগুলির জনপ্রিয়তা আজও লোপ পায়নি। রাজনৈতিক দলগুলিও ইদানীং নানা কবি ও তরজা গানের মাধ্যমে নিজস্ব মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন কিন্তু সেগুলি জনগণের নিকট বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়ায় তা ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। অথচ স্বতঃস্ফূর্ত যে কবিগান বা তরজা গান তার মধ্য দিয়ে নানা ঘটনার প্রকাশ, লোকগীতির অন্যান্য আঙ্গিকে প্রকাশিত নানা বিষয়ের উপর আলোকপাত কিন্তু আজও সমান জনপ্রিয়। যে সঙ্গীত গণচেতনা বৃদ্ধি ঘটায় সেগুলির জনপ্রিয়তার কোন ঘাটতি নেই কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত লোকশিল্প

জনমনে কোন স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে না—অর্থাৎ জনগণের গ্রহণ বর্জন ক্ষমতা এত বেশি যে এই প্রচার-নিষ্ঠ লোকসঙ্গীত লোকশিল্পের মর্যাদাতেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

"জনসংযোগের প্রথম শর্ত হল একটি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ, নইলে সংবাদের পরিসর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়, বিকৃতিও এসে যেতে পারে। লোকসাহিত্যের দুটি সমান্তরাল রচনা রীতি—একটি Narrative ও Descriptive দিক—বস্তুনিষ্ঠতাই যার মধ্যে প্রধান দিক।"[১] এই বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনই লোকসঙ্গীতকে অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যমে পরিণত করেছে। লোকসঙ্গীত-শিল্পীর স্বচক্ষে দেখা ঘটনার বিবরণ, স্বীয় অভিজ্ঞতা লব্ধ অনাচার, অত্যাচার এবং দুর্নীতি—জনসমাজের কাছে সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। হবিবপুরের দারোগার উৎপাতে কিভাবে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তার হদিশ মেলে গম্ভীরা গানের বয়ানে, মানবাজারের হাটে জমিদারের পাইকদের অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যায় ভাদু গানে আবার বাংলা বিহার সংযুক্তির জন্য সরকারী অপচেষ্টার কথা মানভূম ও পুরুলিয়া জেলার টুসু গানে প্রতিফলিত হয়। যে সমস্ত লোকসঙ্গীত ধর্ম-সংক্রান্ত নয় সেগুলির মধ্যেই মূলতঃ এই ধরণের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় অধিক পরিমাণে। কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলার চট্কা গান, চোর-চুরনী বা চক-চুন্নীর গান, মুর্শিদাবাদের আলকাপে, নদীয়ার পঞ্চীর গানে সামাজিক—রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক সংবাদ পরিবেশন করাই প্রধান বিষয়। লেটো গান, হাপু গান এমনকি পটের গানেও অনুরূপ চিত্র দেখা যায়।

বর্ধমানের একটি লেটো গানে ভেকধারী গুরুদেবদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে—

টিকিধারী ভণ্ড-গুরু লোক ঠকিয়ে খায়
সরল ধর্ম-পাগল ওদের কাছে যায়।
পরকালের কথা বলে ওরা লুটে টাকা
টাকা লুটে গুরুজীরা করেন বাড়ি পাকা॥
কত গুরু কলকেতায় আছে বড় সুখে
আংটি দশ আঙ্গুলে কবচ ঝোলে বুকে।

১। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক—লোক-সাংবাদিকতা ও জনসংযোগ (বাংলা সংস্কৃতি ও সংযোগ সমস্যা, সম্পাদক—ক্ষেত্র গুপ্ত) ১৯৮৩। পৃঃ ১৪৩

কেহ মৌনীবাবা জানায় হিজিবিজি টানে
গোপনে কন সখী সনে কথা কানে কানে ॥

ঘুষখোর রেলকর্মচারী সম্পর্কে লেটো গানের একটি ব্যাঙ্গাত্মক ছড়া—

কইলকাতার মামা
গায়ে রেলের জামা।
নাও হাত পেতে
নাও দিনে রেতে।
সিকি টাকা নিয়ে
গনো বাড়ি গিয়ে ॥

"সত্যিকথা বলতে কি লোকসঙ্গীত থেকে গণসঙ্গীতে বিবর্তনের সূত্রই নিহিত সামাজিক ভাবে সংযোগ-সঞ্চারণের সাফল্যের মধ্যে। লোক-সঙ্গীতের জনপ্রিয় 'ফর্ম'গুলির ওপর ভিত্তি করেঃ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হয়েছে জনপ্রিয় গণসঙ্গীতগুলি। এটা কখনই সম্ভবপর হতো না, যদি না ঐ 'ফর্ম'গুলির সংযোগ-সঞ্চারণের ক্ষমতা ব্যাপক হতো।"[১]

স্বভাবতই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে গণমাধ্যমের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো লোকসঙ্গীত এবং মূলতঃ লোকসঙ্গীতের লোক-সাংবাদিকতার সঙ্গীতসমূহ। আরোপিত মাধ্যমের দ্বারা এক বিশেষ সীমা পর্যন্ত গণজাগরণ সম্ভব কিন্তু সার্বিকভাবে গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রথাসিদ্ধ গণমাধ্যমের অন্তর্গত লোকসঙ্গীত তথা লোক-সাংবাদিকতার পর্যায়ভুক্ত সঙ্গীতসমূহই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম।

১। পল্লব সেনগুপ্ত—সংযোগ সঞ্চারণ ও লোক-সংস্কৃতি পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।

লোক-সঙ্গীত

'লোক' শব্দটি কেবল গ্রাম্য সাধারণের জন্যই প্রযোজ্য নয়, যদিও সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রামীন জনগণকেই বোঝায়, তবুও শব্দটি ব্যাপকার্থে গ্রামীণ ও নাগরিক উভয় স্থানের ঐতিহ্যস্নাত সকল জনসমাজকেই বোঝায়। গ্রাম থেকে শহরে বাস করলেই সে লোকসমাজে অপাংক্তেয় হয় না কারণ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের তাগিদে অনেককেই গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এসে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে। আবার শহরে জন্মগ্রহণ করেও জীবন ও জীবিকায় এবং আচার-ব্যবহার, কথাবার্তায় লোক সৃষ্টির অংশীদার হতে পারে অনেকেই।

"Popular antiquities-এর জায়গায় Oral culture অথবা Traditional culture অথবা Unofficial culture ব্যবহার করলে ফোকলোর পণ্ডিতের যথার্থ সান্নিধ্যে আসা যাবে। Tradition-এরও নবমূল্যায়ন প্রয়োজন। কেননা, এর ঐতিহ্যকেই সাম্প্রতিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে চলতে হয়। উর্ধ্বতনবাদী Hartland খুব সুন্দর করে বলেছেন: ঐতিহ্য ক্রমাগত নতুন করে সৃষ্ট হচ্ছে; প্রাক-পুরাণের অব্যয় নাগরিকত্বে নজরবন্দী নই আমরা। ক্রমবর্ধিষ্ণু সমকালও আমাদের জিজ্ঞাসার বস্তু।"[১]

সুতরাং লোকসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয়ে এই ক্রমবর্ধিষ্ণু সমকালকে সামনে রেখেই বিচার করতে হবে। লোকসঙ্গীত—লোকায়ত জীবন-সঙ্গীত বা জীবনাশ্রয়ী সঙ্গীত। জীবন গতিশীল, সমকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। জীবনমুখী-সঙ্গীত বা লোকসঙ্গীতও তাই পরিবর্তনশীল, কারণ জীবনের 'ঘট' থেকেই এই সঙ্গীত তার রস আহরণ করে জীবনের তাগিদেই তা পরিবেশন করে জনগণের মাঝে। সঙ্গীত যেখানে জীবনের সঙ্গে যোগ হারায়, সেখানে তা অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তা আমাদের অতীতচর্চার স্বাদ মিটালেও প্রাণের রসে সিক্ত হয়না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মানস রাজ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও রূপ বদলায়, রূপের পরিবর্তন হয় সঙ্গীতের ভঙ্গিমায়, ভাব, ভাষা এমনকি তার গায়কীতেও। এই

১। ডঃ মযহারুল ইসলাম—ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন, ১৯৫৪। পৃঃ ৪৮৪

পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত না হলে লোকসঙ্গীত তার জীবনমুখীনতা হারায়, সে সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত থাকে না।[১]

নদীর স্রোতের মতই সহজ ও স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল গতিই লোক-সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্রোতস্বতী নদীর জল যেমন একই স্থানে কখনও স্থির থাকে না, যে কারণে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক ঋষি হেরাক্লিটাস (Heraclitus) বলেছিলেন, 'কেউ কখনও একই নদীতে দুবার স্নান করে না' কারণ বহতা নদীর জল সতত প্রবহমান, পরিবর্তনশীল, তেমনি লোক সঙ্গীতও জনজীবনের চলার গতির সঙ্গে সতত চলমান—ক্রম পরিবর্তনশীল। লোক-জীবনের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোক-সঙ্গীতও পরিবর্তিত হতে থাকে, কারণ জনজীবনের শৈল্পিক চেতনাই লোক-সঙ্গীতের ধারক ও বাহক। পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয় লোকসঙ্গীত এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, আপন ঐতিহ্য বহন করে। লোক-সঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয়ে বলা হয়েছে, "Folk song is a music that has been submitted to the process of oral transmission, it is a product of evolution, and is dependent on the circumstances of continuity, variation and selection."[২]

সাধারণভাবে সমস্ত লোকসঙ্গীতের স্বরূপ এক হলেও বাংলা লোকসঙ্গীত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তার সুর ও ভাবের অকৃত্রিমতা ও বৈচিত্র্যে এবং গায়কীর অভিনবত্বে। জনজীবনের মধ্য থেকে উৎসারিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলেখ্য ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের প্রেম-বিরহ, হাসি-কান্না, আচার-আচরণই লোকসঙ্গীতের রূপে প্রকাশিত। এই রূপের নানা বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতায়, সুর কাঠামোর মনোহারিত্বে আর বক্তব্যের গভীরতার তারতম্যে এই বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। ভাবপ্রধান লোকসঙ্গীত এতই ব্যঞ্জনাময় যে, আপাতদৃষ্টি বা আপাত-শ্রুতিতে যে সঙ্গীত সাধারণ জীবননাট্যের আখ্যায়িকার প্রকাশ করেছে বলে মনে হয়, হয়ত বিশ্লেষণে ধরা

১। ডঃ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা, ১৯৯২। পৃঃ ৪৯

২। Ray, M. Lawters—Folk Singers and Folk songs in America, 1951. P 6

পড়ে তারই মধ্যে সুপ্ত রয়েছে কোন উর্ধ্বচেতনা-সম্পন্ন দার্শনিক মতবাদ। লোক-সঙ্গীত যেমন লোকরঞ্জন করে তেমনি লোকশিক্ষাও দেয়।

অধিকাংশ লোকসঙ্গীতই সৃষ্টি হয়েছে নানা ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচার নির্ভর করে। এই ধর্মবিশ্বাস এবং পূজার্চনায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে আদিযুগের সঞ্চিত সংস্কার ও ধ্যান-ধারণা। প্রকৃতিকে একাত্ম করে নিয়ে প্রকৃতিরই নানা সম্পদকে দেবার্চনার উপাচার করা হয়েছে। ধান-দূর্বা, কলা-হলুদ, পান-সুপারী ইত্যাদি তাই মঙ্গলের প্রতীক। জীবনের সমস্ত দৈনন্দিন আচার অনুষ্ঠানের সূচনাতেই রয়েছে সঙ্গীতের প্রকাশ। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবন, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক জীবন—সর্বক্ষেত্রেই সঙ্গীতের পদচারণা। জীবনের রসে আপ্লুত বলে লোকসঙ্গীত অনুভূতি ও ভাবরসের বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে পূর্ণ। রচনার সরল পদ-বিন্যাস, স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সুর, তাল ও লয়ে নিবদ্ধ। জটিল তত্ত্বকথাও সহজ ও সরল ভাবে প্রকাশিত যাতে তা সাধারণের বোধগম্য ও হৃদয়-গ্রাহী হয়।

জীবনবোধের এই বহুমুখী ধারাই বাংলার লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। জীবন যাত্রার প্রতিটি ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রচিত হয়েছে লোকসঙ্গীত। জীবনমুখী প্রেমের গান, বিরহের গান, বিচ্ছেদের গান যেমন আছে তেমনি রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অনাচার ও দুর্নীতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক অবক্ষয়, সমাজ সংস্কার, রাষ্ট্রীয় রাজনীতি ও সমকালীন ঘটনাবলীর গান। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের ভাওয়াইয়া ও চট্কা, মালদহের গম্ভীরা, রাঢ় বাংলার বাউল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর মেদিনীপুরের ঝুমুর, ভাদু, টুসু, আর পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী, জারি, সারি—সবই গোত্রের বিচারে লোকসঙ্গীত, কিন্তু প্রত্যেকটিই একে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র।

"সাঙ্গীতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাঙলার লোক সঙ্গীতের কত রূপ, কত ছক, কত প্রথা যে জড়িত আছে বলে শেষ করা যায় না। কোন গান গাওয়া টানা সুরে, কোন কোন গান আবার আবৃত্তির অনুরূপ। কোন গানের ভাব সহজ, কোন গান জটিল তত্ত্বের প্রচ্ছন্ন তত্ত্বভাবে পুষ্ট। একক, দ্বৈত, সমবেত ও গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে লোকসঙ্গীত গাওয়ার রীতি। গান ভাবে অকৃত্রিম, সুরে স্বতস্ফূর্ত। সামাজিক রীতিনীতি, পল্লীবাসীর ধ্যান-ধারণা এবং তাদের বিবিধ প্রথা ও ভাব—তাদের গানে প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হয়।"[১]

১। মণি বর্ধন—বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, ১৯৬১। পৃঃ ১২৩

বিভিন্ন জাতি ও ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা লোকসঙ্গীতের মূল কাঠামো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তদুপরি শ্রুতিনির্ভর হওয়ার ফলে আদি রূপের নকশা প্রায় বিলুপ্তির পথে, কারণ পারিপার্শ্বিকতার চাপে পরিবর্তনশীল জীবনধারায় সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীত তার মূল অবস্থা থেকে সরে এসেছে অনেকখানি।

বহতা নদীর স্রোতের ন্যায় লোক সংস্কৃতির ক্রম পরিবর্তনশীল ধারা অবলম্বন করে এগিয়ে চলাই লোকসঙ্গীত বিকাশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রুতি নির্ভর হওয়ার ফলে সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এককালের প্রচলিত সঙ্গীত নতুন প্রজন্মের মানুষের ভাবের পরিবর্তন ঘটায়, চিন্তা ও মননশীলতায় আনে নতুন আলোর আভাস। তাই যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোক সঙ্গীতের কথায় ও পরিবেশনায় ধরা পড়ে নতুনত্বের ছাপ। চিন্তাধারার পরিবর্তনে বা নতুন অগ্রগতির প্রবাহে লোকসঙ্গীত স্নাত হয়ে ধারণ করছে নতুন বেশ, যদিও তার শারীরিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই। এই প্রবহমানতা বা গতিশীলতাই লোকসঙ্গীতের প্রাণ-ভোমরা।

"লোক সঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা মৌখিক রচিত হইয়া মৌখিক প্রসার লাভ করে। সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলেও কোনদিনই ইহার লিখিয়া রাখিবার সংস্কার গড়িয়া উঠে নাই। লিখিত হইবামাত্রই সাহিত্য একটি বিশেষ অনমনীয় (rigid) রূপ লাভ করে, কিন্তু যাহা কেবলমাত্র সমাজের স্মৃতিপথ অবলম্বন করিয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে তাহার মধ্যে কখনও একটি সুনির্দিষ্ট (rigid) রূপ গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রবহমানতার মধ্য দিয়াই লোকসঙ্গীতের প্রাণশক্তি রক্ষা পায়। নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া ইহার মধ্যে নূতন নূতন উপকরণ সংগৃহীত হয় এবং তাহার ফলেই ইহার কোন অংশেই জীর্ণতা স্পর্শ করিতে পারে না।"[১]

লোকসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয়ে তার আঞ্চলিকতার প্রভাবও অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনজীবনের স্বাভাবিক প্রভাবেই বিভাবিত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকসঙ্গীত। অরণ্য পরিবেষ্টিত অঞ্চলে প্রিয়জন পরিত্যক্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন বাস করার বেদনার বহিঃপ্রকাশ, বন্ধুর পথে গরুর গাড়ী চালনায় বা খরস্রোতা নদীবক্ষে নৌকা চালনায় শরীরে যে ঝাঁকুনি পড়ে তারই প্রভাবে

১। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৫। পৃঃ ২-৩

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়ায় দেখা যায় স্বরভঙ্গ বা সুরে ভাঙনের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে উদার নদীবক্ষে অবকাশ-কালীন সময়ে ভাটায় নৌকা ভাসিয়ে মাঝি যে গান গায় তাতে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ টানা সুরের যা পূর্ববঙ্গের তথা অধুনা বাংলাদেশের ভাটিয়ালী রূপে প্রচলিত, তেমনি আবার রাঢ় বাঙলার মাটিতে গাওয়া বাউলের গানের চলন তার চলার ছন্দের মতই ছন্দোময়। রাঢ় বাঙলার ঊষর শুষ্ক ও প্রস্তরময় ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সৃষ্ট বাউল গানেরও প্রকৃতি উদাস এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ।

লোকসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে তার আঞ্চলিক উচ্চারণের বিভিন্নতাতেও। যে অঞ্চলের লোকসঙ্গীত তাতে সেই অঞ্চলের ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাব পড়বেই। ভাষার আঞ্চলিক বিশেষত্ব অনুযায়ী একই লোকসঙ্গীতেরও অঞ্চলভেদে ভিন্নরূপী প্রকাশভঙ্গী দেখা যায়। গায়কীতে এই আঞ্চলিক প্রকাশভঙ্গী বা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য (intonation) থাকবেই, এর বিচ্যুতি ঘটলেই সংশ্লিষ্ট লোকসঙ্গীতের আসল রূপটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাষার প্রকাশভঙ্গী অনুযায়ী সঙ্গীতেরও সুরের বিন্যাস ও গায়কী স্বতন্ত্র হয়। এই আঞ্চলিকতার প্রভাব অতিক্রম করে কোনও লোকসঙ্গীত পুষ্টি লাভ করতে পারে না, কারণ সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাষাই লোকসঙ্গীতেরও ভাষা, তাই এই ভাষা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি অতিক্রম করে গড়ে ওঠা সঙ্গীত প্রকৃত লোকসঙ্গীত না হয়ে সেগুলি পর্যবসিত হয় মিশ্র বা মার্জিত (improvised) সঙ্গীতে।

"লোকসঙ্গীত গুরুমুখী বা বিদ্যালয়মুখী নয়। ঘরে বসে রেওয়াজ করে লোকসঙ্গীত আয়ত্ত করা যায় না। একটা বিশেষ অঞ্চলের জনসমাজের জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকালের identification সেজন্য প্রয়োজন। লোকসঙ্গীতের স্টাইলটা আঞ্চলিক জীবনধারা থেকে উদ্ভূত। এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে একটা বিশেষ স্বরসমষ্টি বা ঠাটকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গে মিশেছে আঞ্চলিক কণ্ঠভঙ্গি এবং পারিভাষিক উচ্চারণভঙ্গি।"[১]

বিশেষত্বের বিচারে লোকসঙ্গীত হয় বিভিন্ন পর্যায়ের, যা সাধারণতঃ অন্য সঙ্গীতে পাওয়া যায় না। পর্যায়ক্রম অনুযায়ী ভাগ করলে লোকসঙ্গীতের কয়েকটি রূপ প্রতিভাত হয়, যেমন—(১) আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীত বা

১। হেমাঙ্গ বিশ্বাস—লোকসঙ্গীত সমীক্ষা: বাংলা ও আসাম, ১৩৮৫। পৃঃ ৩৮

ইংরেজীতে যাকে বলে Calenderic বা Ritual Songs. এই গানগুলি মূলতঃ অনুষ্ঠানমূলক, বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে গাওয়া হয়—যেমন, মনসা পূজায় ভাসান গান, পদ্মাপুরাণ বা বিষহরী গান, শিবপূজায় গাজনের গান, বীজ বপনের গান ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক গানের মধ্যে উত্তরবঙ্গের 'হুদুমা দ্যাও'-এর গান কেবল মেয়েরাই গায়, এ গান পুরুষের শোনাও বারণ। এছাড়া আছে (২)—ব্যবহারিক গীত বা functional songs, যা বিশেষ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানেই গীত, যেমন বিয়ের গান, সাধ ভক্ষণের গান, হলুদ কোটার গান, জল ভরার গান, 'আট কড়াই ফুট কড়াই'-এর গান ইত্যাদি। লোক সঙ্গীতের আর এক রূপ—(৩)—কর্ম সঙ্গীত বা শ্রম সঙ্গীত, ইংরেজীতে এগুলিকে বলে work songs. সাধারণতঃ জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে এই গানগুলি সম্পর্কযুক্ত যেমন, ছাত-পেটার গান, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, পাট কাটার গান, মাঝির গান, গাড়ীয়ালের গান ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে বৃত্তিমূলক গান বা Professional songs—যেমন বেদেনীর গান, পটুয়ার গান, সাপুড়ের গান ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়াও লোকসঙ্গীতের আর একটি পর্যায় রয়েছে যা জনজাগরণের গান বা গণ-চেতনার গান ; মূলতঃ যেগুলিকে লোক-সাংবাদিকতা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জীবনের নানা হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম বিরহ ছাড়াও অগণিত জনগণের উপর যে অন্যায়, অবিচার এবং শোষণ চলে প্রতিনিয়ত তারই স্বরূপ প্রকাশ এবং সময়ে সময়ে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার গান—লোক-সাংবাদিকতার পর্যায়ভুক্ত ; জন-সংযোগ বা গণ-জ্ঞাপনের জন্য যে গানগুলি লোকশিল্পী গেয়ে থাকেন গণ চেতনা বৃদ্ধির প্রয়াসে। মৌখিক জন-সংযোগের ক্ষেত্রে এই লোকসঙ্গীত সমূহ অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে এর প্রতিক্রিয়াও তাৎক্ষণিক। জন-চরিত্র অনুধাবন করে তদনুযায়ী লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে গণসংযোগ ঘটানোর ক্ষেত্রে লোক-সাংবাদিকতা পর্যায়ভুক্ত এই সঙ্গীত সমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী গণ-মাধ্যম। লোকসঙ্গীত জনগণের সঙ্গীত, এ সঙ্গীত নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারায় সুরের গজদন্তমিনারে বসে সুর সাধনা নয়, আপামর জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অন্তর্নিহিত রূপের প্রকাশ, গণজাগরণে তাই লোকসঙ্গীত অত্যন্ত প্রভাবশালী গণ-মাধ্যম।

লোকসঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা কোন একক শিল্পীর সৃষ্ট নয়, তা

গণসৃষ্টি। যদিও এই গণসৃষ্টি বা লোকসৃষ্টির অন্তরালে থাকে কোন একক ব্যক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। তারপর কালের নিরিখে ও জনগণের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করে তা লোকসঙ্গীত হিসাবে পরিগণিত হয়। বেশ কিছু লোকসঙ্গীত পাওয়া যায় যেগুলি একক সৃষ্ট হলেও যার আবেদন সমষ্টিমূলক, গণজাগরণের চিন্তা-প্রসূত। সেইসব লোকসঙ্গীতে মূলতঃ ভণিতা থাকে এইরকম, 'দীন শরৎ বলে', 'ভেইবে রাধারমন বলে' বা 'পাগল জালালে কয়', কিংবা সরাসরি 'লালন বলে', 'দুদ্দু বলে', ইত্যাদি গান একক সৃষ্ট হলেও তার সার্বজনীন আবেদনের জন্য লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। এখানে ব্যক্তি সমষ্টি-চেতনারই বাহক। সমাজ জীবনের সার্বিক বক্তব্যই ব্যক্তিমানসের দ্বারা প্রতিফলিত। সমাজ আলোড়নকারী বিশেষ ঘটনা ব্যক্তি মানসের মনশ্চক্ষে ফুটে উঠেছে লৌকিক রীতিতে। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ এমন কি বৃহত্তর ক্ষেত্রে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, জাতীয় আন্দোলন—সবকিছুই লোককবিদের গানে স্থান পেয়েছে। লোক-সঙ্গীতে হয় জনজীবনের প্রতিফলন ; সেই কারণে জীবনেব সব কিছুই লোক-সঙ্গীতে স্থান পেতে পারে।

জনজীবনের ঘটনাবলী লোকসঙ্গীতে পরিস্ফুট হয় বলেই কৃষক-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ, তেভাগা-আন্দোলন, অমর শহীদদের আত্মত্যাগ, বয়স্ক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, নির্বাচন এবং অন্যান্য অনাচার অত্যাচার সব কিছুই লোক-সঙ্গীতে অঙ্গীভূত। গ্রামীন জনগণ যেহেতু কৃষিকার্যের সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ত সেই কারণে লোকসঙ্গীতে গ্রামের কৃষি জীবনের উপর বেশি পরিমাণে গান গাওয়া হয় ; তবে যে লোককবি শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত তার কণ্ঠে শ্রমিক ভাইয়ের দুঃখ-দুর্দশা বা তার উপর মালিকের অন্যায় অবিচারের সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। লোকসঙ্গীতে জনজীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী তাই বার বার এসেছে এবং সমাজের কাছে সেগুলি যথেষ্ট আদৃত হয়েছে এবং এর প্রভাবও পড়েছে জনমানসে—ফলে লোকসঙ্গীত জনজাগরণের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে সার্থক গণ-মাধ্যম।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত

বাংলায় স্বদেশ-প্রেম মূলক সাহিত্যের উদ্ভবের প্রধান কারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক। অবশ্য অ-প্রধান কারণ হিসাবে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবও অনস্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী-শিক্ষিত মানুষ ইংরেজী সাহিত্যের কল্যাণে ইউরোপীয় সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম-মূলক রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মুর, ক্যাম্বেল, বায়রণ—প্রমুখ কবির দেশাত্মবোধক কবিতা উদ্বুদ্ধ করেছিল ভারতের বিদগ্ধ সমাজকে, দেশ-মাতৃকার চরণ বন্দনায়। স্বদেশের শৌর্য-বীর্যগাথা, স্বদেশের কীর্তি-কাহিনী রচনার পরোক্ষ কারণ ইংরেজী সাহিত্যের প্রসার ও ভারতীয়দের উপর তার প্রভাব বিস্তার। দেশ-ভক্তির সঙ্গীত পূর্বে রচিত হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গীত হিসাবে 'হিন্দুমেলা' উপলক্ষে রচিত ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও ভারতের জয়' শীর্ষক সঙ্গীতটিই বাংলায় প্রথম স্বদেশী সঙ্গীত হিসাবে চিহ্নিত। সঙ্গীতটির পূর্ণাঙ্গরূপ যথেষ্ট বড় হওয়ায় এর প্রথম দুই স্তবক এবং শেষ স্তবকই গাওয়া হত।

গাও ভারতের জয়

মিলে সবে ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান
কোন অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান॥
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি কত মণি রত্নের নিধান॥
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়
রূপবতী সাধ্বী-সতী ভারত ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুণি-গণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন
বাল্মিকী বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥
বীর-যোণি এই ভূমি বীরের জননী
অধীনতা আনিল রজনী
সুগভীর সে তিমির ব্যাপিয়া কি রবে চির
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ
পৃথুরাজ আদি বীরগণ
ভারতের ছিল সেতু রিপুদল ধূমকেতু
আর্ত-বন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥
কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়
যতোধর্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয়॥
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়॥

বাংলা স্বদেশী গানের প্রধান উৎস বাঙালীর পরাধীনতা-বোধ। প্রকৃতপক্ষে সব ভাষাতেই স্বদেশী গান রচনার উৎসে দেশের পরাধীনতা বা দেশের বিপর্যয়ের সঙ্কেত কার্যকরী থাকে। ভারতেও স্বদেশ-প্রেমের গানের সূচনা হয়েছে ব্রিটিশ শাসকদের শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর থেকেই। ব্রিটিশ-শাসককুল ভারতীয় জনগণের প্রতি বিভিন্ন সময় যে অন্যায় ও অবিচার করেছে তার প্রতিবাদে এবং বিদেশী শাসকের কবলমুক্ত হয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেসব সঙ্গীত রচিত হয়েছে সেগুলিই দেশাত্মবোধক বা স্বদেশী গান। এই সঙ্গীতসমূহে সাধারণতঃ জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা প্রাধান্য পায়নি, যা প্রাধান্য পেয়েছে তা হল সার্বিকভাবে ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার

প্রতিবাদের স্ফুরণ। দেশের মানুষকে দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল-মুক্তির প্রয়াসে সমবেত করা এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সকলকে সামিল করে দেশমাতৃকার বন্ধন-মুক্তির পথে জনজাগরণের উদ্দেশ্যেই দেশাত্মবোধক গানের সূচনা। অন্যদিকে, স্বাদেশিকতার গানে প্রকাশ পেয়েছে দেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মবলিদানকারী বীর সেনানীদের যশোগাথা, দেশমাতৃকার প্রতি বন্দনা-গীতি এবং ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সার্বিক উন্নতির কথা।

"দেশপ্রেমের গান রচনা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে· আর রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গানগুলিরও নানা পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুমেলা থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত সময়ে রচিত দেশপ্রেমের গানগুলিকে এক অর্থে স্বদেশী সংগীত বলা যেতে পারে।"[১]

উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত যেসব গানের উপজীব্য স্বদেশপ্রেম, অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক সত্তা সম্পর্কে চেতনা, প্রাকৃতিক রূপ-ঐশ্বর্যের অনুধ্যান, সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক অস্তিত্ব সম্পর্কে গর্ব, দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা ও সহানুভূতির বোধ ব্যক্ত হয়েছে সেগুলিই স্বদেশী গান বা দেশমাতৃকার মুক্তি কামনায় গণচেতনা বৃদ্ধির গান। যদিও এই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা এসেছিল ইংরেজী সাহিত্য থেকেই, ইংরেজী সাহিত্য পাঠের দ্বারা শোষক ও শোষিতের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। স্বদেশপ্রেমের এই উপলব্ধি ছিল পরাধীন জাতির বেদনাবোধ সঞ্জাত। মুসলমান শাসনকালে বাঙালী জাতি, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দু জাতি মুসলমান শাসকদের বিদেশী বলে ভাবেনি তাই তখন এই স্বাজাত্য-বোধেরও উন্মেষ ঘটেনি, ফলে তখন স্বদেশপ্রেম কোন স্বতন্ত্র অভিধায় ব্যক্ত হয়নি। কারণ মুসলমান শাসকবৃন্দ কখনও ভারতবাসীদের ভিনদেশী এবং 'কালা আদমি' বলে ভাবেনি। অন্যদিকে, ইংরেজ ভিন্ন জাতি; তাদের ভিন্ন ভাষা, তদুপরি তাদের শাসন-প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ফলে ভারতবাসীর কাছে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচারণ করার অর্থ ছিল লুঠেরাদের বিরুদ্ধে জনজাগরণ। উপরন্তু ইংরেজরা প্রথম থেকেই যে ভাবে অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করেছিল এবং দেশের মানুষের প্রতি যে ঘৃণা পোষণ করত, ভারতবাসীকে 'নিগার',

১। গীতা চট্টোপাধ্যায়—বাংলা স্বদেশী গান। ১৯৮৩। পৃঃ X

'নেটিভ', 'কালা-আদমি' সম্বোধনে অবজ্ঞা প্রকাশ করত, ভারতবাসীর পরিশ্রমের সুফল স্বদেশে চালান দিত—সব কিছুই ভারতীয়দের চোখে ছিল নিষ্ঠুর লুঠতরাজের সামিল। এই চিন্তা থেকেই ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে ভারতবাসী আর তখন থেকেই স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয় ভারতবাসী তথা বাঙালীর অন্তরে। এই স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণাতেই স্বদেশী গীত বা দেশ-ভক্তিমূলক গানের সৃষ্টি। প্রতিটি স্বদেশী গানের উৎসে ছিল পরাধীনতার জ্বালা, এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য আত্ম-ত্যাগের প্রেরণা, দেশের প্রতি মমতা ও ভালবাসা, দেশের জন্য দুঃখবরণের প্রতিজ্ঞা—আর ছিল এই প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করতে দেশবাসীকে সচেতন করা। দেশকে মাতৃকা রূপে কল্পনা করে তার চরণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার বিনম্র আবেদন তাই কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৎকালীন সময়ের গান—

ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা, সকল-বহা মাতার মাতা॥
ওমা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা—
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥

অন্যদিকে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদের দ্বারা দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখে আত্মাহুতি দিয়েছে অজস্র দামাল ছেলে। রক্তে তাদের খুনের নেশা ধরিয়েছে কোন কোন উদ্দীপক গান, কেবল অনুনয় বিনয় নয়, কেবল আবেদন

নিবেদন নয়, সশস্ত্র বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছে বিদ্রোহী কবি কাজী-নজরুল ইসলামের সেই জ্বালাময়ী সঙ্গীত—

(১)

কারার ওই লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল্ কররে লোপাট রক্ত জমাট
শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী !

ওরে ও তরুণ-ঈশান, বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ !
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি ॥

(২)

গাজনের বাজনা বাজা ? কে মালিক ? কে সে রাজা ?
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে ?

হা হা হা পায় যে হাসি ভগবান পরবে ফাঁসি ?
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে ?

(৩)

ওরে ও পাগলা ভোলা ! দে রে দে প্রলয়-দোলা
গারদগুলা জোর সে ধরে হ্যাঁচকা টানে !
মার হাঁক হায়দারী হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন-পানে !

(৪)

নাচে ওই কাল-বোশেখী কাটাবি কাল ব'সে কি ?
দে রে দেখি ভীম কারার ওই ভিত্তি নাড়ি।
লাথি মার্, ভাঙ রে তালা যত সব বন্দীশালায়—
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।

অবশ্য এই ধরণের উদ্দীপনামূলক গান খুব বেশি রচনা করা হয়নি, কারণ ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সময়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করেই স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ চলত, তাই সন্ত্রাসবাদী কোন সঙ্গীত রচনা করা বা কোন সাহিত্য প্রকাশ করা ছিল অত্যন্ত বিপদের কাজ। চারণ কবি মুকুন্দদাস

সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের গোপনীয় রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ফরিদপুর জেলায় মুকুন্দদাস নামে জনৈক চারণকবি দেশদ্রোহিতামূলক গান গেয়ে জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।[১]

দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে যেমন গণজাগরণের গান রয়েছে তেমনি আছে দেশমাতৃকার বন্দনাগীত। দেশকে মাতৃভাবে বন্দনা করে নানা সঙ্গীত রচিত হয়েছে যেগুলির সঙ্গে উদ্দীপনামূলক স্বদেশী গানের ঠিক মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য দেশকে আপন করে নিয়ে তাকে পূজার বেদীতে বসানোর মধ্য দিয়েও দেশাত্মবোধ জাগানো যায় এবং এক সময়ে এই একাত্মতাবোধ জাগরণের প্রয়োজনও ছিল। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রকে যে ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং যে মন্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল, তার মূলেও ছিল দেশকে মাতৃভাবে পূজা করা। এই দেশবন্দনা গীতও অন্যভাবে অনুপ্রাণিত করেছে দেশবাসীকে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে এক হয়ে দেশমাতৃকার চরণ বন্দনা করে আত্মাহুতি দেওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে উৎসাহ যুগিয়েছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের লেখা এমনি একটি দেশ-বন্দনা গীত।

জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে।
পুজিব পা দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে॥
আমরা অভাজন জানিনা মা কেমন
তবু মা পালিতেছ অন্নজলে রাখি কোলে॥
নাহি মা অঙ্গে বল সম্বল অশ্রুজল
দিব তাই ভক্তি-ফুলে শ্যামল পদ-কমলে॥
হৃদয়ের ছিন্ন তারে ডাকি মা আজ তোমারে
হৃদয়ে ভাত তুমি ফুল্ল শ্বেত শতদলে॥

স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে এই দেশ-বন্দনার রূপের পরিবর্তন ঘটেছে, ঘটেছে কল্পনার পরিসরেরও। দেশমাতৃকার প্রতীক হয়েছে জাতীয় পতাকা, দেশ জননী আজ কোন রূপ-কল্প নয়, দেশের মাটি, পাহাড়, নদী সব কিছুই

১। 'One Muknnda Das has been touring the district of Faridpur and this leader has attracted attention by the seditious nature of performances.' —Report on Pabna. Faridpur, Dacca, Rangpur, Mymensing. IB File no. 15/B/1908, Serial No. 11/1908.

আজ দেশ মাতৃকা রূপে প্রতিভাত। আধুনিককালে দেশ-বন্দনার একটি গানের নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে এই লেখকের নিজের লেখা একটি গান। এটি ১৯৭৬ সালে আকাশবাণী, শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্র থেকে প্রথম প্রচারিত হয়—।

শাশ্বত হোক শাশ্বত হোক ত্রিবর্ণ ওই ভারত-জ্যোতির
সার্থক হোক সুন্দর হোক এ পতাকা সূর্য-জ্যোতির ॥
আমাদেরও বুকে বুকে একই সে শপথ আজ,
আমরাও লক্ষ্যে স্থির ॥
ত্যাগের ধর্মে দিলে যে দীক্ষা শান্তির দিয়েছো প্রাণ
জনগণ মনে মনে গ্রাম-শহরের কোণে চিরতরুণের জয়গান।
আর কেউ নই মোরা নিজভূমে পরবাসী
মোরাই মালিক ভারত-ভূমির ॥
তোমার প্রেরণা আজ শিখিয়েছে ভাঙা মনে
জীবনের অন্য মানে—।
শুকনো নদীর মত হৃদয়ের কূলে আশা
বাঁচবার জোয়ার আনে ॥
আমরাও তাই আজ নিবেদিত লাখো প্রাণ
পাশে আছি দেশ-জননীর ॥

গণ-সঙ্গীত

"গণ-সঙ্গীত সমাজ বদলের গান। শান্তি কামনায় উজ্জীবিত সারা পৃথিবীর মানুষকে এক সূত্রে গাঁথার গান। অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, গণহত্যা আর মানবসভ্যতা ধ্বংসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কুসুমিত ইস্পাত।"[১]

রুশ বিপ্লবের পর থেকেই 'গণ' শব্দটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে শিল্প, সাহিত্য সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কী যে তত্ত্ব তুলে ধরেন তার সঙ্গে সঙ্গেই গণ-সাহিত্য বা গণ-সঙ্গীতের ধারণা বিশ্বব্যাপী রূপ নেয়। গোর্কীর সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতা তত্ত্বের মধ্যেই এর মূল সূত্রটি নিহিত। শ্রমজীবী মানুষ যে একটি বিশাল শক্তি এবং ভবিষ্যৎ সমাজ জীবন গড়ে তোলার দায়িত্ব যে এদেরই হাতে ন্যস্ত হবে—গোর্কীর এই বোধ থেকেই 'গণ-সংস্কৃতি' কথাটিরও সৃষ্টি হয়েছে।

ফরাসী দেশের থিয়েটার 'লিবর' বা স্বাধীন থিয়েটার, জার্মানীর 'অটো-ব্রাহম্'-বা নব স্বাধীন থিয়েটার, ইংলণ্ডের টমাস গ্রেইনের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটার' এবং রমঁ্যা রোল্যাঁর 'পিপল্‌স থিয়েটার' প্রভৃতি নাট্য আন্দোলন তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিমনা যুবসমাজকে আকৃষ্ট করে, ফলে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই প্রগতিশীল সাহিত্যিকবৃন্দ গড়ে তুলতে চাইলেন এক গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই সময়ে লণ্ডনে অধ্যয়নরত তরুণ ভারতীয়—সাজ্জাদ জাহির, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইকবাল সিং, মুলুক্‌রাজ আনন্দ্ প্রমুখ ১৯৩৪ সালে একটি সর্বভারতীয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' স্থাপনের পরিকল্পনা করেন।

অবশ্য প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণচেতনা বৃদ্ধিতে ১৯২১ সালে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে গণচেতনার গানও বিস্তার লাভ করে। এর আগে অবশ্য গণচেতনার বৃহত্তর প্রেক্ষিতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নীলবিদ্রোহের গান, এবং ঊনবিংশ শতকে সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও কৃষক বিদ্রোহের নানা গান সঙ্কলিত হয়ে জনগণের মনে গণচেতনার ঢেউ

১। শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ– গণ সঙ্গীত। ১৯৮৫। পৃঃ ১৭

তুলেছিল। সেক্ষেত্রে তৎকালীন রাশিয়ার অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লবের চিন্তাধারাই গণসঙ্গীতের প্রেরণা যোগায়। স্বভাবতই সারা পৃথিবীর শোষিত সমাজের গান হিসাবেই গণ সঙ্গীতের শুরু এবং আজও সেই সার্বিক সমাজবাদী চিন্তাধারায় শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের সোচ্চার প্রতিবাদের গানই গণসঙ্গীত-রূপে গৃহীত। কিন্তু বাংলা 'গণ-সঙ্গীত' নামের সূচনা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক পটভূমিকায়।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ-অধিবেশনে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। মুন্সী প্রেমচাঁদ ছিলেন এই সংঘের সভাপতি। ১৯৩৯-৪০ সালে কলকাতার ছাত্র-ফেডারেশনের কিছু প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রী যেমন, নিখিল চক্রবর্তী, রেণু রায়, চিন্মোহন সেহানবীশ মিলে গড়ে তোলেন 'ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট' বা YCI. এর সম্পাদক ছিলেন জলিমোহন কাউল। এই শাখার সঙ্গীত বিভাগে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সুকান্তের গান যেমন ছিল, তেমনি ছিল ১৭৪৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গীত 'লা মার্সাই'। হিন্দীতে এই গানের অনুবাদ করেছিলেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অব কমর বাঁধ্ তৈয়ার হো
লক্ষ্ কোটি ভাইয়োঁ।
হম্ ভূখ্‌সে মরণেওয়ালে
ক্যা মওত্‌সে ডরণেওয়ালে
আজাদী কা ডঙ্কা বজা
উঠাও অগ্নি ধ্বজা
স্বর্গ যুগ্‌কি শেষ পুকার
আতি হ্যায় বারংবার
হো তৈয়ার হো তৈয়ার ॥
মজদুর হোসিয়ার
হো কিষাণ হোসিয়ার
ভীত বুঝ দিলোঁকি হার
কভি নেহি করেঙ্গে স্বীকার ॥

এই সব গানের সঙ্গে ইতালী ও রুশ দেশের গণসঙ্গীত এবং 'ইন্টার-ন্যাশনালে'র গান নিয়ে তৈরী হল গানের স্কোয়াড। ইউজিন পাতিয়ের লিখিত

কথা এবং পিয়ের দেগেতার সুরারোপিত—'ইণ্টারন্যাশনাল' সঙ্গীতটির বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস—।
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস॥
সনাতন জীর্ণ কু-আচার
চূর্ণ করি জাগো জনগণ।
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ॥

শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড
এসো মোরা মিলি এক সাথ।
গাও ইণ্টারন্যাশনাল
মিলাবে মানব জাত॥

গণসঙ্গীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে 'গণনাট্য সংঘ' গঠনের কথাও বলা প্রয়োজন। পুরণচাঁদ যোশী ছিলেন গণনাট্য সংঘ গঠনের মূল প্রেরণাদাতা। ১৯৪৩ সালের মে মাসে তৎকালীন বোম্বাইতে (অধুনা মুম্বাই) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রগতি লেখক সংঘের' তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন। এরই পাশাপাশি একটি সম্মেলনে গঠিত হয় "ভারতীয় গণনাট্য সংঘ"। এর সর্বভারতীয় চরিত্র বজায় রাখতে ইংরেজীতে নাম রাখা হয় 'Indian Peoples Theatre Association বা সংক্ষেপে IPTA. গণনাট্য সংঘের স্বরূপ বিশ্লেষণে এর বুলেটিনের প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়—

"It is in this situation that the Indian Peoples Theatre Association has been formed to coordinate and strengthen all progressive tendencies that have so far manifested themselves in the nature of dramas, songs and dances. * * * It is a movement which seeks to make our arts, the expression and the organiser of our peoples' struggles for freedom, economic justice and democratic culture. It stands for the

defence of culture against imperialism and fascism and for enlightening the masses about the causes and solutions of problems facing them. It tries to quicken their awareness of unity and their passion for better and just world order."[১]

তৎকালে ফ্যাসিবাদী ভয়াবহতার বিভীষিকাময় ছায়া, জাপানী আক্রমণ, ধনতন্ত্রের তীব্র সঙ্কট, দুটি মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মন্বন্তর, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নতুন পথ বাছাইয়ে উদ্বুদ্ধ করে। প্রেরণা আসে নতুন সমাজবাদী জীবনধারার সুস্থতা ও সকলের মিলে মিশে সুন্দর জীবন যাপনের আদর্শের। মধ্যবিত্ত সমাজ-ব্যবস্থাও তখন ভাঙছে, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, চোরাচালান, দৈনন্দিন মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি মানুষকে এক চরম হতাশার মধ্যে ফেলে। এই সময় প্রয়োজন ছিল এক সুসংহত নীতিবোধ জাগ্রত করার জন্য কোনও জোরালো সংগঠন, ভাঙার কাজ জোড়া লাগানোর সেতুবন্ধনের পথ আবিষ্কার। এই মানবিক সেতুবন্ধনের জন্যই সৃষ্টি হল 'নবজীবনের গান', এলো গণনাট্য আর শিল্প সংস্কৃতিতে উপেক্ষিত ও অবহেলিত মানুষের কথা। বিনয় রায়, বিজন ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অসংখ্য প্রগতিশীল সংস্কৃতিমনা শিল্পী, সাহিত্যিক ও নাট্যকার পাদপ্রদীপের আলোয় দেখা দিলেন। গণ-সঙ্গীতের শিল্পী হিসাবে এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, শচীন দেববর্মন, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কলিম শরাফী প্রমুখ। বিনয় রায়, হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রেম ধাওয়ানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'Voice of Bengal' নামে গণসঙ্গীতের দল। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের সময় এই দল সারা ভারতবর্ষে গণসঙ্গীতের মাধ্যমে গণজাগরণ ঘটায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতেই বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে গণসঙ্গীতের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। দিকে দিকে নানা আন্দোলন, ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতি গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। রেল ধর্মঘট, ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট, ছাত্র আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ প্রভৃতি গণ-

---

১। শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ—গণ-সঙ্গীত। ১৯৮৫। পৃঃ ২২

আন্দোলন সেই সময়ে ভারতবর্ষকে উত্তাল করে তুলেছিল। রেল ধর্মঘটের সময়ে সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে প্রচলিত গণসঙ্গীত :

ঢেউ উঠ্‌ছে কারা টুট্‌ছে আলো ফুট্‌ছে
প্রাণ জাগছে, জাগছে জাগছে।
গুরু গুরু গুরু গুরু ডম্বরু পিনাকীর বেজেছে বেজেছে বেজেছে।
মরা বন্দরে আজ জোয়ার জাগানো ঢেউ
তরণী ভাসানো ঢেউ উঠছে॥
শোষণের চাকা আর ঘুরবে না ঘুরবে না
চিমনীতে কালো ধেঁায়া উঠবে না উঠবে না
বয়লারে চিতা আর জ্বলবে না জ্বলবে না
চাকা ঘুরবেনা চিতা জ্বলবেনা ধেঁায়া উঠবেনা
লাখে লাখ করতালে হরতাল হেঁকেছে
হরতাল, হরতাল, হরতাল, আজ হরতাল আজ চাকা বন্ধ্॥
(আর) পারবে না ভোলাতে মধুমাখা ছুরিতে
জনতাকে পারবে না ভোলাতে।
(আর) পারবে না দোলাতে মরীচিকা মায়াতে
বিভেদের ছলনায় ছলিতে॥
মিছিলের গর্জন দুর্জয় শপথে গর্জে
আজ হরতাল আজ চাকা বন্ধ্॥

গণনাট্য আন্দোলনের দুটি ধারা। এক—নাগরিক মধ্যবিত্ত শিল্পীদের গণজীবন সংলগ্ন শিল্প তৎপরতা আর কৃষক শ্রমিক দিন-মজুর বা খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত গায়ক-শিল্পী লোককবিদের রচনা এবং সঙ্গীতে শাসন-শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ ও অপসংস্কৃতি বিরোধী নতুন শিল্পসৃষ্টির ধারা। সমাজবাদী দৃষ্টিতে গণসঙ্গীতের যথার্থ সংজ্ঞা আমরা পাই গণনাট্য সংঘের সপ্তম রাজ্য সম্মেলনের বিবরণীতে, সেখানে বলা হয়েছে, "পুঁজির দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং বুর্জোয়াদের উপর প্রলেতারিয়েতের জয়ের বিজয়-সংগীত হচ্ছে গণ-সঙ্গীত।

"সুতরাং গণ-সংগীতে প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা সমাজের কৃষক-শ্রমিকদের জীবন ও সংগ্রামের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হবে। অতএব যে-কোন সংগ্রাম বা আন্দোলনের গান মানেই গণ-সংগীত নয়। সেই সংগ্রাম বা আন্দোলন

প্রণেতারিয়েতদের হতে হবে। সমাজবাদী দৃষ্টিতে এইখানেই অন্যপ্রকার সংগ্রামী গানের সঙ্গে গণ-সংগীতের পার্থক্য।”[১]

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও গণসঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি, বা তার প্রবাহও স্তিমিত হয়ে পড়েনি, কারণ এই প্রবাহ মন্থর হওয়ার কোন অবস্থারই সৃষ্টি হয়নি এখনও—অর্থাৎ শোষণের হাত থেকে ভারতবাসী এখনও মুক্তি পায়নি। এ শোষণ, অন্যায় আর অত্যাচার পরদেশীদের দ্বারা না হলেও দেশবাসীদের দ্বারাই দেশবাসীকে শোষণ, সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের দ্বারা নিম্নবিত্ত জনগণকে শোষণ, কালোবাজারী, ঘুষখোর আর দুর্নীতিগ্রস্তদের দ্বারা সার্বিক শোষণ, অনাচার আর অত্যাচার আজও সমানে চলেছে। তারই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে আজও তাই গণসঙ্গীত এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। আজও তাই গণসঙ্গীতে ওঠে নিপীড়িত জনগণের ঐক্যবদ্ধ শপথ, ‘জনতার সংগ্রাম চলবেই’। সিকান্দার আবু জাফরের কথায় সুর দিয়েছেন কণ্ঠশিল্পী শেখ লুৎফর রহমান নিজেই—

জনতার সংগ্রাম চলবেই।
আমাদের সংগ্রাম চলবেই
হতমানে অপমানে নয়, সুখ-সম্মানে।
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাম্ভের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলছে চলবেই॥
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই॥

১। ডঃ উৎপলা গোস্বামী—কলকাতায় সংগীতচর্চা। ১৯৯১। পৃঃ ১০৩

লোকসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং গণসঙ্গীতের পারস্পরিক সম্পর্ক

লোকসঙ্গীত লোক সমাজ থেকে উত্থিত লোককবির দ্বারা গীত এবং লোক সম্প্রদায়ের জন্য গ্রথিত সঙ্গীত। জনগণের নিজস্ব সমস্যা ও তার প্রতিকার এবং সোচ্চারে অন্যায়ের প্রতিবাদ—লোক-সাংবাদিকতার গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সঙ্গীত জনগণের নিজস্ব পদ্ধতিতে ও নিজের পরিচিত জনের দ্বারা পরিবেশিত। এ গান যেন জনগণের বিবেক-চেতনার গান, ঘুমন্ত-জনগণকে সজাগ করার গান। লোক-সংস্কৃতির প্রাথমিক স্তরে যাত্রাপালাই ছিল জনজাগরণের অন্যতম পন্থা। এই যাত্রাপালায় 'বিবেকে'র বিশেষ ভূমিকা থাকত, সে অন্যায়কারীর সামনে যে অশনি সঙ্কেত রয়েছে তার উল্লেখ করে অত্যাচারীকে সাবধান করে দিত আবার শোষিত জনগণকে একতাবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের প্রতিবাদেরও আহ্বান জানাত। এই 'বিবেক'ই সাধারণ জীবনে চারণ কবির ভূমিকা নিয়েছে, আর চারণ-কবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় লোক-কবিদের মধ্যেই। লোকসঙ্গীত সুরে, ভঙ্গিতে ও বাক্য বিন্যাসে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ।

অন্যদিকে, দেশের মুক্তি কামনায় বিদেশীদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার বাসনায় যে স্বদেশ চেতনামূলক সঙ্গীত রচনা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ-শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে, তাতে বুদ্ধিবৃত্তিশালী জনগণকেই আকৃষ্ট করা গেছে, গ্রামের সাধারণ মানুষের মনে সার্বিক অনুপ্রেরণা জাগেনি। এ যেন জনসাধারণের মাথার উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া সুরের আহ্বান, তাকে ধরতে পারেনি সাধারণ জনগণ। দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনে দিন মজুর আর সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কি প্রয়োজন মিটবে সে কথা কিন্তু এই দেশাত্মবোধক গানের মাঝে পাওয়া যায়নি। ফলে এর আবেদন সকলকে সমানভাবে ছুঁয়ে যায়নি।

গণসঙ্গীতের ব্যাপ্তি বিশাল হলেও দেশের সাধারণ গ্রামীণ জনগণকে তা নাড়া দিতে পারেনি। শোষিত মানুষের কথা থাকলেও গণসঙ্গীত দিন মজুর আর খেটে খাওয়া সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেনি,

ফলে গণসঙ্গীতের আহ্বানে গ্রামীণ জীবনে তরঙ্গ ওঠেনি কোনও। মূলতঃ শোষক ও শোষিতের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে রচিত এইসব গণসঙ্গীতকে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গণচেতনার গান বলা যায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে অন্যায় অবিচার চলে প্রতিনিয়ত তার কথা খুব কমই প্রকাশ পেয়েছে গণসঙ্গীতে। দেশাত্মবোধক গানের পরিধি যেখানে কেবল দেশমাতৃকা তথা ভারতবর্ষ, গণসঙ্গীতের ব্যাপ্তি সেখানে দেশের গণ্ডী পার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত। পৃথিবীর অগণিত শোষিত সমাজের বিস্তৃত অঙ্গনে গণসঙ্গীতের বিচরণ। বিপরীতক্রমে, লোক-সাংবাদিকতার গানের ক্ষেত্র নিতান্তই সীমিত, কোন এলাকার জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বা তাদের উপর অন্যায় অত্যাচারের কাহিনীতেই লোকসঙ্গীত সীমাবদ্ধ। ব্যাপ্তির বিচারে তাই লোকসঙ্গীত আঞ্চলিক, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত জাতীয়, আর গণসঙ্গীত —আন্তর্জাতিক।

"গণসংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ লোকসংগীতের ধারাটি গণ-সংগীতেরই অন্তর্গত, কিন্তু গণসংগীত মাত্রই লোকসংগীত নয়। গণ-সংগীত কথাটা অনেক বেশি ব্যাপক। স্বদেশী সংগীত বা দেশাত্মবোধক গীত বলতে আমরা যা বুঝি, তার সাথে ভাবে ও ভঙ্গিতে একটা পার্থক্য বুঝাবার জন্যই গণ-গীতি বা গণসংগীত শব্দটার উৎপত্তি। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশ চেতনা এবং পরাধীনতার বেদনাবোধে যে গীতের জন্ম, তাকে আমরা স্বদেশী সংগীত কিংবা দেশাত্মবোধক সংগীত বলে থাকি। সেই স্বদেশী সংগীতের একটা বড় অংশ ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল, অনেক সময় আবার জাতীয় চেতনা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রভাবান্বিত ছিল। সে সব গানে দেশাত্মবোধের আবেগ ও বেদনা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-বিদ্রোহের চেতনা ছিল না। দেশের মুক্তির সঙ্গে শোষণ মুক্তির চিন্তার মিলন ঘটেনি। শ্রমজীবী জনতাই দেশ, তাদের মুক্তি ছাড়া দেশের মুক্তি অর্থহীন, একথা সেদিনের গানে ব্যক্ত হয়নি। স্বদেশ চেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিললো সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম।"[১]

১। হেমাঙ্গ বিশ্বাস—লোক সংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম। ১৩৮৫। পৃঃ ১৪৯

সঙ্গীত সৃষ্টির প্রেরণার বিচারেও লোকসঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত ও গণসঙ্গীতে পার্থক্য রয়েছে। এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত বিশেষ শ্রেণীর আবেদনে ঋদ্ধ সঙ্গীতের পরিশীলিত রূপ পাওয়া যায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও গণসঙ্গীতে, আন্দোলনের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয় এই সব গান সঙ্গীতবেত্তা ও সঙ্গীত শিল্পীর দ্বারা। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির অন্তর তাগিদ এখানে নেই—যা আছে লোকসঙ্গীতে। যে তাৎক্ষণিক আবেগ লোকসঙ্গীত সৃষ্টির প্রধান প্রবাহ তার অভাব থাকে নাগরিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীতবেত্তাদের সৃষ্ট দেশাত্মবোধক বা গণ-সঙ্গীতে। ফলে 'গণ' সঙ্গীত হলেও তা সার্বিক জনগণের একান্ত আপন সঙ্গীতে পরিণত হতে পারেনি।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের উৎস যেমন শহর-কেন্দ্রিক, সীমানা সারা ভারতময় ছড়ানো, পরিশীলিত কথা আর পরিমার্জিত সুরে পরিবেশনের ফলে তার আবেদন সর্বতোমুখী হলেও জনগণের গান হয়ে ওঠেনি। গণসঙ্গীত দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আপন ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে দেশের বাইরেও, চিন্তা ভাবনায় স্থান পেয়েছে আন্তর্জাতিকতা, গানের বিষয় সারা পৃথিবীর শোষিত জনগণের দীর্ঘশ্বাসের কাহিনী; স্বভাবতই এগুলি মাটির মানুষের কাছে আপন হয়ে ওঠেনি কখনও। গণ-সঙ্গীতের সুর ও তার বাণী নিপীড়িত জনগণের কথা বললেও এর প্রকাশভঙ্গি সাধারণের মন ছুঁতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাস একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—কোনও এক কৃষক সভায় দাপটের সঙ্গে গণসঙ্গীত পরিবেশনের পর উৎসাহী সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ উপস্থিত জনগণের গণসঙ্গীত কেমন লেগেছে জিজ্ঞাসা করায় উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ বলেছিলেন, 'আপনেরা গাইচেন তো বালাই, তয় এগুলান বাংলায় গাইলে আমগো বোজনের সুবিদা অইত'—অর্থাৎ গান তাদের প্রাণে কোন দাগ কাটেনি—যদিও সব কটি গণ-সঙ্গীতই ছিল বাংলায়। গণসঙ্গীতের স্বর জনগণের মনে দাগ না কাটার কারণ পৃথিবীর প্রত্যন্ত ভাগের যে ঘটনায় রাজনীতির তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কিন্তু শান্ত গ্রামীন জীবনে তার ঢেউ পৌঁছায় না একেবারেই। কেবল যারা শ্রমজীবনের বিশেষকরে কলে বা কারখানায় শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত, তাদের কাছেই এ গানের সার্বজনীন আবেদন কিছুটা সাড়া জাগায়। অন্যথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রচিত শ্রমিক শোষণের গানের সঙ্গে বাঙলার গ্রাম জীবনের সাধারণ মানুষ একাত্ম হতে পারে না। তাদের কাছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নানা দুঃখ

দুর্দশা বা অবিচার অত্যাচারের কাহিনী-কথাই বেশি আকর্ষণীয় ও অনেক বেশি আপন-গান।

"বিংশ শতাব্দীর স্বদেশী আন্দোলন বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও গণ-চেতনা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই সময়কালে রচিত সংগীতগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গানগুলির অধিকাংশতেই পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ব্যক্ত হয়েছে। এমনি সাধারণভাবে দেখলে হয়তো মনে হবে এগুলি গণসংগীতের সমগোত্রীয়। কিন্তু সমাজবাদী সূক্ষ্ম বিচারে গানগুলি গণসংগীতের চরিত্র থেকে একটা মৌলিক পার্থক্য সর্বদাই বজায় রেখেছে। প্রথমতঃ স্বদেশী গানগুলি যে আন্দোলনের জন্য রচিত হয়েছিল, সে আন্দোলন ছিল পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের সে আন্দোলনে সামিল করলেও রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের অধিকারের কথা স্বীকৃত হয়নি। কারণ তাতে পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের স্বার্থসিদ্ধি হয় না। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামিল করতে হলে সুকৌশলে তথাকথিত ধর্মকে কৃষ্টির মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়, ফলে সমাজবাদীদের দৃষ্টি অনুসারে এই ধরণের স্বদেশী গান 'গণসংগীত' থেকে পৃথক হয়ে পড়ে।"[১]

গণসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের মধ্যে আরও এক পার্থক্য এই দুইয়ের প্রকাশভঙ্গিতে, স্বতস্ফূর্ততার পরিপ্রেক্ষিতে। এই সম্পর্কে লোককবি রমেশ শীলকে এক সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর গাওয়া লোকসঙ্গীত 'মাইজভাণ্ডারী' জাতীয় গানে যে কাব্যমাধুর্য ও প্রকাশে স্বতস্ফূর্ত আবেদন ঝরে পড়ে তার আভাস তাঁরই গাওয়া গণসঙ্গীতগুলিতে কেন পাওয়া যায় না। উত্তরে লোককবি তথা গণ-সঙ্গীতশিল্পী রমেশ শীল বলেছিলেন, "একটা আইসছে 'অন্তরের তাগিদে' আর একটা 'বাইরের আন্দোলনের তাগাদায়"—অর্থাৎ যে মরমীয়া ভাবে আপ্লুত হয়ে লোককবি রমেশ শীল গাইতে পারেন—

'আমার ভাবের ঘরে আগুন দিল কে রে
সদাই পরাণ খুঁজে বেড়ায় তারে।'

সেই কবিই যখন গণ-সঙ্গীত করেন তখন তাঁর স্বতস্ফূর্ততা কোথায় যেন

১। ডঃ উৎপলা গোস্বামী – কলকাতায় সংগীতচর্চা। ১৯৯১। পৃঃ ১০৩-১০৪

হারিয়ে যায়। শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব-দর্শন, শোষিতের মুক্তি তথা বিশ্বমানবের মুক্তি প্রভৃতি উচ্চমার্গের চিন্তাধারা গণসঙ্গীতের শিল্পীর ভাবের ঘরেও সেভাবে আগুন জ্বালাতে পারেনি। উপলব্ধির গভীরতা থেকেই আসে কাব্যেব মাধুর্য। 'বাইরের তাগাদা' যখন 'অন্তরের তাগিদ' হবে, শুধু তখনই সে কাব্য যথাযথ কাব্য-সুষমামণ্ডিত হয়ে রসোত্তীর্ণ হয়।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের বিষয় বিন্যাসে যে ব্যাপকতা আছে তা নেই প্রতিবাদী লোকসঙ্গীতে। প্রতিবাদী লোকসঙ্গীত বা লোক-সাংবাদিকতার অঙ্গ হিসাবে যে সব গান সৃষ্টি হয়েছে তার বিস্তৃতি স্বল্প পরিসরে, বিশেষতঃ সেই অঞ্চলে বা কখনও দেশের শাসক বর্গের বিরুদ্ধে কিন্তু সে গান কখনও সার্বজনীন ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি, কারণ সেই ধরনের বৃহত্তর পরিসরে গণ আন্দোলনের পরিস্থিতি গড়ে তোলার কথা চিন্তাই করতে পারেনি এই সব লোককবির দল। স্বদেশী গান ও গণসঙ্গীতের সঙ্গে জাগরণ-মূলক লোকসঙ্গীতের এখানেই পার্থক্য।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের রূপকার শহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী মহল, যাঁদের আসরে লোককবির দল কোনদিনই সমান পংক্তিতে বসতে পারেননি, ফলে পারস্পরিক চিন্তা ভাবনাতেও রয়েছে পার্থক্য। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের বাণী যে পরিশীলিত ভাষায় লেখা হয়েছে সেই ভাষা গ্রামীণ জনগণের কাছে দুর্বোধ্য। অন্যদিকে লোকসঙ্গীতে পরিশীলিত ভাষা ব্যবহারের সুযোগ নেই কারণ লোকসঙ্গীত তার আঞ্চলিক ভাষাতেই সৃষ্ট, পরিশীলিত বা মার্জিত বাণীতে নিবদ্ধ বা আরোপিত কথার মালায় গ্রথিত হলে লোকসঙ্গীত তার মর্যাদা হারায়। এই কারণে যে অঞ্চলের প্রতিবাদী গান কেবল সেই অঞ্চলের কথাতেই তা গৃহীত, ভাষার বিচারে তার সার্বজনীনতা নেই। যে গান তার নিজস্ব অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষা নয়, সে গান কখনও জনগণের কাছে আদৃত হয় না, সেই কারণে লোকসঙ্গীত তার নিজস্ব এলাকার ভাষাতেই রচিত হয়। বাংলা ভাষা এক হলেও আঞ্চলিক শব্দ চয়ন ও প্রকাশভঙ্গির ফলে তার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকেই, এই আঞ্চলিকতাই লোকসঙ্গীতের প্রাণ-ভোমরা। এই সঙ্গীতের আবেদন সর্বব্যাপী না হলেও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এর আবেদন গভীর। কিন্তু গণসঙ্গীত-সার্বিক জন-গণকে নিয়ে সার্বজনীন চিন্তাধারায় আবিষ্ট হয়ে পরিশীলিত সঙ্গীত কাঠামোর

মধ্যে সৃষ্টি হয়। এর সার্বজনীনতার আবেদনে কোন আঞ্চলিকতার সীমাবদ্ধতা প্রশ্রয় পায়না।

অন্যদিকে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ব্যাপকতা সর্বভারতীয়, কোন বিশেষ অঞ্চলের সীমানায় তা সীমাবদ্ধ থাকলে সম্পূর্ণ একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট হয়ে তা সার্বজনীন দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মর্যাদা পায় না। সেক্ষেত্রে লোক-সঙ্গীত সৃষ্ট ও পুষ্ট হয় বিশেষ অঞ্চলে এবং এর বৈশিষ্ট্যেও তাই আঞ্চলিকতার প্রাধান্য। শব্দ চয়ন, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ও গায়কী—সব কিছুতেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের 'আঞ্চলিকানা'র (লোকসঙ্গীতবিদ্ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কথায় 'বাহিরাণা') ছাপ স্পষ্ট। আর দেশ-কাল-পাত্র ভুলে সর্বজনের জন্য আবেদনমুখী যে সঙ্গীত তাইই গৃহীত হয় গণসঙ্গীত রূপে। এর মধ্যে সঙ্কীর্ণতার স্পর্শ থাকতে পারে না। সামগ্রিক বিচারে তাই লোক-সাংবাদিকতার গান যখন আঞ্চলিক, দেশাত্ম-বোধক গান তখন সর্বভারতীয় আর গণসঙ্গীতের রূপ আন্তর্জাতিক।

লোক-সাংবাদিকতার গান

লোক-সাংবাদিকতার সঙ্গীত হিসাবে যেগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে গণচেতনার গান অন্যতম। অবশ্য গণচেতনার গান এস্থলে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত, পর্যায় অনুযায়ী এগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: দেশাত্মবোধক, স্বাদেশিকতা, গণ-চেতনা এবং প্রতিবাদী গান। বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের সূচনা হিসাবে চর্যাগীতি থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে গীতগোবিন্দম, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলী, পাঁচালী, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, আখড়াই ও টপ্পার পর উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে পৌঁছে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ধারার প্রবাহ দেখা যায়; ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুমেলা' উৎসবের সময় থেকেই। লোকসঙ্গীতের ধারা অবশ্য বয়ে চলেছে একাদশ শতাব্দী থেকেই, নাথ-গীতিকার সূচনাতেই।

কিন্তু বাংলা কাব্য সঙ্গীতের ন্যায় লোকসঙ্গীতেও দেশাত্মবোধক ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটে উনবিংশ-শতাব্দীর সপ্তম দশকে মূলতঃ 'হিন্দুমেলার' সময় থেকেই। বিদেশী ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে দেশমাতৃকার মুক্তি এবং বিদেশী শাসকদের নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশমাতৃকার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের বর্ণনা এবং দেশবন্দনাই এইসব সঙ্গীতের মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। জন-জাগরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে সঙ্গীতকেই প্রথম অবস্থায় সাগ্রহে গ্রহণ করা হয়। এবং যেহেতু কাব্য সঙ্গীতে জনগণের প্রাণের কথা স্বতস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়নি বা আপামর জনগণের আপন প্রাণের ভাষায় সেগুলি গীত হয়নি, সেইজন্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীতেও লোকসঙ্গীতের প্রাধান্য সূচিত হয় বিভিন্ন কাব্য সঙ্গীতে লোকসঙ্গীতের সুরের অনুকরণের ও প্রয়োগের মাধ্যমে।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুমেলা'র দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' বাংলায় অন্যতম দেশাত্মবোধক সঙ্গীত কিন্তু এটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আঙ্গিকে খাম্বাজ রাগে আড়ঠেকা তালে নিবদ্ধ-গান। এর ভাষাও ছিল সাধারণের পক্ষে কষ্টকর অনুধাবনযোগ্য, ফলে এই গানের কাব্য-মূল্য যতই হোক আমজনতার কাছে ছিলনা প্রাণের স্পর্শ।

"এর পরে ঐ মেলা উপলক্ষে আরো অনেক জাতীয় সংগীত রচিত হ'ল, কিন্তু খাঁটি বাংলা ঢঙে ও সুরে জাতীয় সংগীত কেউ রচনা করেছে বলে জানা যায় না।"[১] এই অভাব-বোধ থেকেই লোক সুরে ও কোনও কোনও স্থানে গ্রামীণ ভাষাতেও রচিত হল দেশাত্মবোধক গান, বলা যায় স্বদেশী গানে দেশী সুর এবং দেশী ঢঙে গান রচনার প্রেরণা তখন থেকেই।

বাঙালীর শিক্ষা, দীক্ষা, আত্মমর্যাদা ও গৌরবের অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত করেন লর্ড-কার্জন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গ-ভঙ্গের আদেশ কার্যকর করে। বাঙালী উদ্বেলিত হয় বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের জোয়ারে। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের ন্যায় বাঙলার লোক কবিরাও বেরিয়ে পড়েন তাঁদের গানের ডালি নিয়ে। আর এই সঙ্গীতের সমর-সজ্জায় নব-অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ওঠে বাঙলা গান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে। প্রথম দিকে ধ্রুপদী সঙ্গীত রচনায় নিমগ্ন হলেও পরবর্তী পর্যায়ে কবি বাঙলার দেশাত্মবোধক আন্দোলনে সামিল হন— তাঁর গানের বাণী ও সুর নিয়ে। বাঙলার প্রাণের সুর লোকসঙ্গীতকে বেছে নিলেন তাঁর সঙ্গীত রচনার হাতিয়ার হিসাবে। "ভাব ও ব্যঞ্জনার প্রাধান্য নিয়ে কথা ও সুরের মধ্যে সৃষ্টি হোল মিলনের আবেদন। বাউল, ভাটিয়ালী, জারি ও সারি গানের মন্দাকিনী ধারা হোল উৎসারিত। সারিগান—'এবার তোর মরা গাঙে', বাউল—'যদি তোর ডাক শুনে' ও ভাটিয়ালী—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' প্রভৃতি।"[২]

ক. দেশাত্মবোধক লোকসঙ্গীত

বাংলার এই যুগ-সন্ধিক্ষণে কেবল প্রখিতযশা কবি ও শিল্পীরাই সোচ্চার হয়েছিলেন তা নয়, বাহ্য জগতের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন বা উদাসীন বাউল ও পল্লীর লোক-কবিরাও পিছিয়ে থাকেননি দেশ মাতৃকার মুক্তি সাধনায়, অত্যাচারী শাসকের বিরোধিতায় এমন কি প্রয়োজনে অন্যান্য অনাচার ও দুর্নীতির বিরোধিতা করতেও। সমাজের লোক-দর্পণ হিসাবেই লোকশিল্পীগণ তাঁদের গানের মাঝে ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজ-চিত্র, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন এবং জনজাগরণের জাগরণমূলক গানও গেয়েছেন। শুধু অধ্যাত্মবাদ আর গুহ্য

১। শান্তিদেব ঘোষ - রবীন্দ্রসঙ্গীত। ১৯৬২। পৃঃ ৯৩

২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান। ১৯৬৫। পৃঃ ৫১—৫২।

তত্ত্বকথা নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত থাকেন নি, মানুষের মাঝে না থেকেও তাঁরা খুঁজে বেড়িয়েছেন 'মনের মানুষকে।' মৌলবাদীদের নির্যাতন আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এইসব লোককবি সামাজিক সত্যকে রূপ দিয়েছেন রূপকের মাধ্যমে, কখনও বা স্পষ্টভাবেও। শোষণের বিরোধিতা, সামাজিক অনাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর ধর্ম-নিরপেক্ষ সুস্থ জীবন-চেতনার প্রভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে পড়েছে এইসব লোকসঙ্গীতে। স্বভাবতই এই গণ-চেতনা সমৃদ্ধ লোকায়ত ধারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

পরাধীন ভারতে মুক্তি কামনায় যে গণ-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, সেই গণ-সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে যেসব লোকসঙ্গীতে দেশাত্মবোধক ভাবধারার-প্রবাহ পরিস্ফুট হয়েছিল সেইগুলিকেই দেশাত্মবোধক লোকসঙ্গীত পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। বৃটিশ-শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে লোক কবিরা এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমন কয়েকটি সংবাদপত্র বৃটিশ শাসনের সমালোচনা করে দেশের জনগণকে উদ্দীপিত করেছিল, অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছিলেন এইসব লোককবি। চারণ কবি যতীন দাস এমনই একজন, যাঁর গানে বৃটিশ সরকারের লুণ্ঠনের এক চিত্র ফুটে উঠেছে।

(১)

ধন্য মোদের দেশের চাষা।
সোনা-রূপা যত ছিল বৃটিশ সরকার হ'রে নিল
শেষে কাগজ এসে উদয় হল নিলো তামা কাঁসা।
ধন্য মোদের দেশের চাষা॥
আমরা হইলাম এমন নিষ্ঠ ভাত-কাপড়ে পাইলাম কষ্ট
এমনি মোদের দুরাদৃষ্ট সোনা নিয়ে দিল সীসা।
ধন্য মোদের দেশের চাষা॥

স্বাধীনতা আন্দোলনে জনজাগরণের আর একটি উদ্দীপনামূলক গান গেয়েছেন আব্বাসউদ্দীন আহমেদ।

(২)

ওঠ্‌রে চাষী জগৎবাসী ধর কষে লাঙ্গল।
(ও-ভাই) আমরা ছিলাম পরমসুখী ছিলাম দেশের প্রাণ
(তখন) গলায় গলায় গান ছিল ভাই গোলায় গোলায় ধান।
(আজ) কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ
(ও ভাই) মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল ॥
(আজ) জাগরে কৃষাণ সবতো গেছে কিসের বা তোর ভয়
(এই) ক্ষুধার জোরেই করবো এবার সুধার জগৎ জয়।
(ঐ) দিগ্বিজয়ী দস্যু রাজার হয়কে করবো নয়
(ওরে) দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল ॥

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের উপর একটি দেশাত্মবোধক গান তখন বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মণিরামপুর গ্রামের লোককবি জনৈক রাধানাথ বৈরাগীর দৌলতে। গরু এবং শূকরের চর্বি মিশিয়ে তৈরী টোটা ভারতীয় সেনাদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল বলে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল সেনাদের মধ্যে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গানটি শোনা যায় লোকশিল্পীদের কণ্ঠে।

(৩)

কি সব্বোনেশে কথা যাদু বলি গো তোমায়।
কলিযুগের মাহিত্মম দোষ দিওনা আমায় ॥
নবাব বাদশা গেল তল
উর্দিপরা চেংড়া বলে কত জল
হায় হায়রে যাদু বলি গো তোমায়
ফাঁসি কাষ্ঠে মরণ হইল পাণ্ডা মহাশয় ॥ (মঙ্গল পাণ্ডে)
বেরেলীতে দাঙ্গা হইল ফৈজাবাদে আটক রয়
যতসব রাজপুরুষ মেম আর সাইব (সাহেব) মহাশয়।
দেশে দেশে লাগল দাঙ্গা হিন্দু আর মুসলমান।
জাতির পতিত অতি গর্হিত
এই দুঃখে সব করে বিহিত।

হিন্দুর অখাদ্য খাদ্য গোমাংস
মুসলমানের হারাম শূকর মাংস
দুইয়ে মিলে টোটা বানায়
সাদা চামড়ায় গুলি চালায়।
আরও আছে মজার কথা কইতে লাগে ডর
কোম্পানীর ফৌজ আসি কান্ধে করবে ভর।
এইসব হল আত্মগ্লানি বহুদিনের ব্যাধি
দুই ভায়েতে এক সাথেতে উঠল এবার মাতি।
ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ তুঙ্গ ঘোড়ায় চ'ড়ে
বীরদর্পে শস্ত্র চালায় ইংরাজ মাঝারে।
(ও তার) মূর্তি দেখে ভিরমী লাগে চোক্ষে ছোটে বজ্রপাত
শত্রু সেনা কেটে্য চলে সঙ্গে নিয়ে দশটা হাত।
মাগো তোমায় গড় করিগো সঙ্গে নিও বরাভয়
শত্রুসেনা ধ্বংস করি এসো তুমি এ বাঙলায়।
হায়গো মোদের আশা ভরসা সব বুঝি ফুরালো
কোম্পানীরই জয় হলো আশার প্রদীপ নিভলো।
মরলো যত গুলি খেয়ে দেশের বড় নেতা
তাইনা দেখে দেশবাসীর ধরেছে আজ মাথা।
অধম রাধানাথ বলে শেষে ধরি দুটি হাত
একত্র হইও ভাই না করিও বিসম্বাদ॥

খ. স্বাদেশিকতার লোকগান

স্বাদেশিকতায় এমন সঙ্গীত সংগৃহীত হয়েছে যেগুলি স্বদেশের মুক্তি কামনায় আত্মবলিদানকারী দেশপ্রেমিকের যশোগাথা এবং স্বদেশী আন্দোলনের দ্যোতক। দেশ গড়ার কাজে বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে দেশজ-দ্রব্যাদির ব্যবহার এবং স্বরাজের ভাবনায় ভাবিত দেশগানের ডালি নিয়েই সঙ্কলিত হয়েছে স্বাদেশিকতা পর্যায়ের লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিকতা অনুযায়ী তার সুরের চলন নির্ভরশীল, কিন্তু সর্বকালের লোকসঙ্গীত—যার আবেদনও

সার্বজনীন; সেগুলি জনগণের স্মৃতিতে রক্ষিত হয়ে এবং অঞ্চলভেদে সুরের পার্থক্য হেতু নানা স্থানে একই গানের কথা ও সুরে বিভিন্নতা দেখা যায়, যদিও এই পাঠান্তর খুব সামান্যই এবং তার ফলে সঙ্গীতের সাঙ্গীতিক গুণের কোন অবমূল্যায়ন ঘটে না। অত্যাচারী ইংরেজ বড়লাটকে হত্যা করতে গিয়ে বালক ক্ষুদিরামের ফাঁসীর মঞ্চে আত্মবলিদান তাই পল্লীর কোণে কোণে গীত হয়েছে, উদ্দীপিত করেছে আপামর জনগণকে। মানুষের মনে পৌঁছে দিয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধে অমর শহীদের বাণী। কোন সংবাদপত্র বা অন্য কোনরকম প্রচার মাধ্যম যে কাজ করতে পারেনি, সেই কাজে সাফল্য এনেছে—গ্রাম্য কবির গাওয়া একটি গান। গানটির রচয়িতা বাঁকুড়ার পীতাম্বর দাস। এই লোকগীতিটি তখন সকলের মুখে মুখে। এর ফলেই গানের শব্দে কিছু রকমফের দেখা যায়।

(৪)

একবার (এবার) বিদায় দাও মা (দে মা) ঘুরে আসি।
(আমি) হাসি হাসি পরবো ফাঁসী দেখবে ভারতবাসী (জগৎবাসী)।
(ওমা) কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে (লাইনের ধারে) (মাগো)
(ওমা) বড়লাটকে মারতে গিয়ে (মারবো বলে)
(মারত) মারলাম (আর এক) ইংলণ্ডবাসী ॥

শনিবার (শনিবার দিন) বেলা দশটার পরে (কালে)
হাইকোর্টেতে (জজ কোর্টেতে) লোক না ধরে (মাগো)
হল অভিরামের দ্বীপ চালান (দ্বীপ দ্বীপান্তর) মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসী ॥

হাতে যদি থাকতো ছোরা, তোর ক্ষুদি কি পড়তো ধরা
(ওমা) রক্ত মাংসে এক করিতাম, দেখতো জগৎবাসী ॥

বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি রইল মা তোর ব্যাটা বেটি (মাগো)
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা, বৌদের করিস দাসী ॥
দশমাস দশদিন পরে জন্ম নিবো মাসীর ঘরে (মাগো)

(ওমা) চিনতে যদি না পারিস মা (তখন যদি না চিনতে পারিস)
দেখবি গলায় ফাঁসী ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে দেশবাসী হাহাকার করে ওঠে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার মানসে তাঁর দান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলে স্মরণ করেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে সাংবাদিকের লেখা শোক-সংবাদের ন্যায় লোককবিও তাঁর গানের মাধ্যমে এই বার্তা পৌঁছে দেন ঘরে ঘরে; এ যেন বেতারে ধারাভাষ্য বা সাংবাদিকের বিশেষ প্রতিবেদন।

(৫)

চিত্তরঞ্জন স্বদেশী প্রাণধন
ত্যজিলেন জীবন দার্জিলিং গিয়ে।
মৃত্যু সমাচার টেলিগ্রাফ পেয়ে তার
ভারতবাসী হাহাকারে উঠল কাঁদিয়ে॥
তেরশো বত্রিশ সালে দোসরা আষাঢ়
পরলোক গমন করিলেন এবার
কাঁদে বাসন্তী দেবী সি-আর দাশের লাগি
স্বদেশী অনুরাগী গেল ছাড়িয়ে॥
তেস্‌রা কলিকাতায় পাঠালেন অঙ্গ
ইঞ্জেকসন করি দিলেন সর্ব অঙ্গ
সাজিয়ে নানা ফুলে গাড়িতে লয়ে তুলে
হরিবোল হরিবোল বলে যাচ্ছে চলিয়ে॥
চৌঠা সাতটায় প্রাতঃকালে
শিয়ালদা ষ্টেশনে নামিয়ে দিলে
লোকেতে লোকারণ্য স্বদেশী যত সৈন্য
শোকেতে হয়ে মগ্ন রয়েছেন চেয়ে॥
শ্মশানে লয়ে যায় হ্যারিসন রোড দিয়ে
করপোরেশন ইষ্ট্রিট চৌরঙ্গী হয়ে
ঘুরে যায় বহুদূর রসা রোড ভবানীপুর
কালীঘাট কেওড়াতলায় পৌঁছিল গিয়ে॥
সৎকার্যের তরে মহাত্মাগান্ধী
চিরশয্যার তরে বাঁধিলেন বেদী

আনিয়া চন্দন কাষ্ঠ সাজাইয়া নরশ্রেষ্ঠ
ঢালি উৎকৃষ্ট ঘৃত দিল জ্বালিয়ে ॥
অসার সংসার রামকৃষ্ণ ভাবে
হরি বলিতে প্রাণ কবে এ প্রাণ যাবে
গোঁসাই গোপালের চরণ করি আমি নিবেদন
দিও শ্রীচরণ অন্তিম সময়ে ॥

বাউল, ফকির এবং ভিখারীদের মধ্যে দেখা যায় এই ধরনের নানা স্বাদেশিকতার গান গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বা ট্রেনের কামরায় ভিক্ষা করতে করতে গেয়েছেন। এর ফলেই বিভিন্ন ঘটনা প্রচারিত হয় বিভিন্ন লোকের কাছে, বিভিন্ন স্থানে। লোকসঙ্গীতের লোকানুরঞ্জন ছাড়াও লোকশিক্ষার এই বিশেষ ভূমিকা পালনই লোক-সাংবাদিকতার অন্তর্গত। প্রচার-মাধ্যমের গতিবিধি যেখানে সীমিত, লোক-সঙ্গীতের সেখানে অবাধ গতি। ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের কাছেই লোক কবির লোকগান সমান আদৃত ও সহজবোধ্য, ফলে জনমানসে এর প্রভাবও অসীম। বৃটিশ সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে অনশন করে দেহত্যাগ করেন শহীদ যতীন দাস। তাঁর মৃত্যুতেও লোক কবিরা গান বেঁধেছেন, শুনিয়েছেন দেশের প্রত্যন্ত ভাগে, এই ভাবেই বৃটিশ শাসনের অপকীর্তির কথা প্রচারিত হয়েছে।

(৬)

যতীন দাস তো জেলে ম'ল
ভারত স্বাধীন দেখলে না।
সোনার ভারত দুখান হ'ল
কারও কথা শুনলে না ॥
তেষট্টি দিন উপোস করে
বলি হল মায়ের পায়ে
তেমন নেতা আর কি হবে
রঙ্গ ভরা এই বঙ্গে ॥

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় পট পরিবর্তনের কালে তাঁর অন্তর্ধান রহস্যের আজও কিনারা হয়নি, কিন্তু দেশবাসীর কাছে সুভাষচন্দ্র প্রতিভাত পরিত্রাতা হিসাবে। স্বাধীনতার স্বল্পসময় পরেই দেশের নানা অনিশ্চয়তা ও চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ক্ষণে তাই দেশবাসীর কামনা 'সুভাষ ফিরে এসো'। তারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে পল্লী কবির গানেও।

(৭)

ভারতের রত্ন নেতাজী সুভাষচন্দ্র
কোথায় রয়েছ তুমি আমাদের ছাড়িয়া।
তোমার আশাতে আছি মোরা বাঙালী
দরশন দাও এসে কোরনা কাঙালী।
শত শহীদের আত্মত্যাগেতে, পাইল ভারত স্বাধীনতা
বড় দুঃখী মোরা হয়ে ভাগ্যহারা, ঘুচলো না তবু পরাধীনতা।
স্বাধীন ভারতে না খেয়ে মরে লোক
হেন দুঃখের কথা শোনগো বিধাতা
তুমি পরিত্রাতা এসে দাও দেখা
কোরনা কোরনা এর অন্যথা॥

স্বদেশী আন্দোলনে যাঁরা কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের কি অবর্ণনীয় অবস্থায় কাটাতে হয়েছে সেই সম্পর্কেও জনগণকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তৎকালীন লোক কবিবৃন্দ। কারাগারের এই অবর্ণনীয় অবস্থার প্রচার হওয়ার পর বৃটিশ সরকার কারাগারগুলির সামান্য উন্নতি করার চেষ্টা করেন এবং রাজবন্দী বা স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের উচ্চতর শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করেন। রাজবন্দীদের দুর্দশা সম্পর্কে একটি লোকসঙ্গীত—

(৮)

মনরে ছোবার দড়ি পাকাও
আর সকাল বেলা লপ্‌সি খাও॥

দেশের কাজে এলেম জেলে,
স্নান কর মন ড্রেইনের জলে
আবার প্রস্রাব পাইখানায় গেলে
দুর্গন্ধে নাক টিপিয়া রও ॥

মধ্যাহ্নে ভাতে তরকারী, অসিদ্ধ চিবাইয়ে মরি
এবার ডালেতে তেঁতুল যোগ করি
চোখ বুজিয়ে মুখেতে দাও ॥
বৈকালে মৎসের ঝোল, মৎসহীন কাঁটার গণ্ডগোল
আবার শয্যার সাজ রয়েছে কম্বল
তাহাতে শুইয়ে নিদ্রা যাও ॥

গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছিল চরকায় সুতা কাটা। দেশে তখন স্বরাজের আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সকলে চরকায় সুতা কাটার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন। দেশবাসীকে চরকায় সুতা কাটার প্রেরণা যুগিয়ে স্বাদেশিকতার গানও গেয়েছেন লোকসঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ। এমনি একটি গান—

(৯)

ও ভাই ভাবনা কি আর আছে
গান্ধী রাজা আনবে স্বরাজ দুঃখ যাবে ঘুচে।
তাঁতী যারা আছরে ভাই সব তাঁতের কাপড় বুনাও বইস্যা
বাবুরা সব খদ্দর পইরবেন ঠাইরণরাও পইরবেন খাসা।
আবার নূতান মন্ত্র দিছেরে কানে, চরকা-তকলী হাতে নিয়া
(ও ভাই) রাস্তা ঘাটে চলতে ফেরতে তকলীর মেলা দেখ গিয়া।
এবার কায়েত ভদ্দর বেরাম্ভণ যত আছেন বৈদ্যজন
সবাই ইবার তাঁতের কাপড় বায়না দিছে, ভাই সাহেবের দুঃখু গেছে।
ইবার বুঝি সুদিন আইল স্বরাজ ঘরে আইসা গেল
ইবার একই সঙ্গে গাও দেহি ভাই গান্ধী রাজের জয় ॥

খ. গণ-চেতনার লোকগান

সার্বিকভাবে গণ-জাগরণের গানই গণ-চেতনার গান। যে গানে সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনা জাগানোর আহ্বান রয়েছে, রয়েছে একসঙ্গে সংগ্রামের ডাক। জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও অ-গ্রহণীয়—সব গানই গণচেতনার গান। বিদেশী শাসকের প্রবর্তিত বিভিন্ন অধ্যাদেশ যেমন বর্জন করার আহ্বান জানানো হয়েছে তেমনি দেশীয় সরকারের প্রবর্তিত নানা নীতি সমর্থনের জন্যও জনগণকে আহ্বান করা হয়েছে। গণ-চেতনা বৃদ্ধিতে এক্ষেত্রে লোকসঙ্গীত নিয়েছে অন্যতম গণ-মাধ্যমের ভূমিকা। অন্যায়, অবিচারের বিচার করে প্রতিবাদ জানানোর ঠিক পূর্বেকার অবস্থায় জন-মানসে বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে জনগণকে প্রতিবাদী অবস্থায় তৈরী করতে গণ-চেতনার প্রয়োজন, অন্যথা মানসিক প্রস্তুতির অভাবে আসল উদ্দেশ্যই জনগণের মনে দাগ কাটতে পারে না। স্বভাবতই গণ-চেতনার গান গণ-আন্দোলনের প্রথম ধাপ। অন্যায়, অবিচার সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করানোর জন্যই গণ-চেতনা সৃষ্টি করা। বাংলার লৌকিক চারণকবির দল তাঁদের গানের ডালি নিয়ে পৌঁছে গেছেন আপামর জনগণের কাছে, তাঁদের লোক-সঙ্গীতে রয়েছে গণ-চেতনার পূর্বাভাস। এইসব গানে সরাসরি প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়নি, কেবল অন্যায় অবিচারের বিচার করে তার কুফল সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করা হয়েছে।

(১০)

এবার শ্যাত[১] ইন্দুরে কইরলো সারা
(ভাইরে) ধানের বাজার হইল আক্কারা[২]
গরু বাছুর মাইয়্যা মানুষ, ছাওয়ালপান যুবা পুরুষ
একই ভাবে হইল হারা[৩]।

যুদ্ধ লাইগছে রাজায় রাজায়
মধ্যথিকা[৪] মইরলো পেরজায়[৫]
ন্যাতাগো[৬] সব ফাটক[৭] দিছে

উচিত কথা কইবে কে।

শব্দার্থ: ১—শ্বেত-ইন্দুর অর্থাৎ সাদা চামড়ার শাসক বা ইংরেজ, ২—অভাব ৩—সারা, ৪—মাঝখান থেকে, ৫—প্রজা, ৬—নেতাদের, ৭—কয়েদ বা জেল।

কইলে পরে জরিমানা গারদখানা
ভাতে মারা ত্যাশ-ছাড়া।
আছে মোগো হকল[১] জানা।
এতেও নাকি সোয়াস[২] নাই
বসাইচে কনট্রোল[৩]
(ও ভাই) চাউল হইয়্যাছে পঞ্চাশ ট্যাহা[৪]
চৌদ্দ পুরুষ যা শুনি নাই
কেরেচ ত্যাল[৫] পাওয়া যায় না
চেনিতো[৬] চোখেই দেহিনা[৭]
গেরামের যত বাবু ভুইঞা, গুড় দিয়া ছা[৮] খাইয়া
ফুড কমিটি কইরচে খাড়া।

বল্লাল সেনের চতুর্বর্গ শ্রেণী বিভাজনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি জাতের বিভাগ সম্পর্কেও লোক-কবিরা এই শ্রেণী বিভাজনের অসারতার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এর কুফল সম্পর্কে সকলকে সজাগ করে দিয়েছেন। প্রখ্যাত লোককবি দুদ্দু শাহের এই গানটি জনচেতনা বৃদ্ধিতে অনবদ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।

(১১)

বল্লাল সেন শয়তানী দাগায়
গোত্র জাত সৃষ্টি করে যায়।
বেদান্তে আছে কোথায়, আমরা দেখি নাই॥
জাতি আর সম্প্রদায় মিলে
ভারত শ্মশান করিলে
বিনয় করে দুদ্দু বলে, বুঝে দেখ ভাই।

কৃষক এবং শ্রমিকের উপর শোষণের যাঁতাকল চেপে বসে আছে প্রথম থেকেই, এদের পরিশ্রমের ফসল ভোগ করছে সমাজের একদল স্বার্থপর মানুষ। এই শোষক দলের মুখোস খুলে দিতে সোচ্চার হয়েছেন লোক-কবিকুল। লোকশিল্পী রমেশ শীলের সঙ্গীতে তারই আভাস—

শব্দার্থ : ১—সকল, ২—স্বস্তি, ৩—কন্ট্রোল, ৪—টাকা, ৫—কেরোসিন তেল, ৬—চিনি, ৭-দেখিনা বা দেখতে পাইনা, ৮-চা (উচ্চারণ বিকৃতিতে 'ছা' হয়েছে)।

(১২)

আমার খুনে মোটর গাড়ি, তেতালা চৌতালা বাড়ি
আমার খুনে রেডিও আর বিজলীবাতি জ্বলে।
আমি কৃষক তুমি মজুর দিনে রাতে খাটি
দুই শক্তি এক হইলে তারা পিছু যাবে হটি।
এক সঙ্গে নিঃশ্বাস ছাড়ি, পর্বত উড়াইতে পারি
দুশমন চক্রে চাওনা ফিরি কী আছে তার মূলে॥

সরকারী শোষণের বিরুদ্ধেও লোক-কবিরা সোচ্চার হয়েছেন, রক্ষকই যেখানে ভক্ষকের রূপ নেয়, সেখানে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। —এই অবস্থার কথাই প্রকাশ করেছেন অন্যতম সাধক লোককবি লালন শাহ। তাঁর একটি লোকগীতি—

(১৩)

রাজেশ্বর রাজা যিনি
চোরেরও সে শিরোমণি
নালিশ করবো আমি
কোনখানে কার নিকটে?
গেল ধনমান আমার
খালি ঘর দেখি জমার
লালন কয় খাজনারো দায়
কখন যেন যায় লাটে।

পার্বত্য ময়মনসিংহের হাজোং সম্প্রদায়ের উপর সেখানকার সুসং জমিদার নানা অত্যাচার চালায়। এর প্রতিকারে সমবেত হাজোংদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে লোককবি নিবারণ পণ্ডিত তাঁর গানের দল নিয়ে গ্রামে গঞ্জে জমিদারের এই অত্যাচারের কথা প্রচার করেন। হাজোং আন্দোলনের এই গান জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিল জমিদারের অত্যাচার প্রতিরোধে। গানটি এইরূপ—

(১৪)

মোদের দুঃখের কথা কাহারে জানাই,
সারা বছর খাট্যা মরি প্যাটের ক্ষুধায় ভাই।
শুনরে ও ভাই কৃষক যত হিন্দু মুসলমান
অন্নদাতা হইয়া আমরা কি পাই প্রতিদান।
ম্যাঘে ভিজ্যা রইদে পুড়্যা ফলাইলাম ফসল
সেই ফসলে পরের গোলা ভরিল কেবল।
ধনী বণিক জমিদার আর বিদেশী সরকার
চার ভূতে লুইট্যা খাইল মোদের সোনার সংসার।
কর্জা বাবদ ঋণের বাবদ মহাজনের ঘরে
লোটা বাটি গরু বাছুর লেইখ্যা নিল পরে।
তামাক লবণ জলের ট্যাক্স দিয়া হইলাম খুন
তার পরে সুপারী গাছে লাগাইলরে আগুন।
(মোদের) কিনতে লাগে যে সব জিনিস কিনি দশগুণ দিয়া
আমারি সব ধান চাউল নিল মাথায় বারি দিয়া।
ল্যাখাপড়া শিখতে পায়না মাইয়া ছেইলা যত
মুখ্যু হইয়া পরাণ লইয়া থাকি পশুর মত।
যে জমিতে বাপ দাদাদের শ্মশান কবর ছিল
সেই জমিতে অধিকার নাই শরীলে নি সয় বল।
হালের মুঠি ছোঁয়না যারা সুখে করে বাস
তারাই হইল জমির মালিক আমরা ক্রীতদাস।
ময়মনসিং জিলাতে মোদের লেংগুড়া বাজারে
বাজার ভাইঙ্গা নিতে আইল সুসং জমিদারে।
সেই গোল ভাঙাতে গিয়েছিল কৃষক নেতাগণ
মণি সিং আর আলতাব আলি আরও কয়েকজন।
তাদের মাথায় দিল বারি পুলিশ গুণ্ডার দলে
জোর করিয়া ধইরা নিল কাছারি মহলে।
শুইন্যা দ্যাশের পুরুষ নারী হাজারে হাজারে
লাঠি খোঁটা নিয়া গেল লেংগুড়া বাজারে।

বলছে সবাই করবো লড়াই কেহ না ফিরিব
প্রাণ দিতে হয় দিব মোরা প্রতিশোধ তার নিব।
ভয় পাইল গুণ্ডার দল আর পুলিশ নায়েব যত
তারা কৃষক নেতা মণি সিং-এর হইল পদানত।
ক্ষমা ভিক্ষা চাইল তারা সকলে মিলিয়া
ফিরে গেল জনতা সব নেতার কথা শুনিয়া।
শুনরে ও ভাই কৃষক যত হওরে হুঁশিয়ার
এমন লীলা নাইরে কিন্তু সারা দুনিয়ায় ॥

কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করা হয় বিভিন্ন ভাবে, যারা জোগায় অন্যের অন্ন, তারাই থাকে উপবাসী। এই দুঃসহ অবস্থার দিকে সকলকে সচেতন করে লোককবি গেয়েছেন গণচেতনার গান। উত্তরবঙ্গের লোকগীতি 'ভাওয়াইয়া' সুরে আবদুল করীমের লেখা গানে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে—

(১৫)

ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে ॥
চতুর্দিগে জ্বলে সুরজ বাতি, তোমার বল ক্যানে আন্ধার রাতি
হায়রে হায়, পরার বোঝা তোমরা কদ্দিন বইবেন ভাই ॥
ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে ॥
বালুটিলটিল্ পঙ্খী কান্দে নিজের আহার খুঁজির বাদে[১]
হায়রে হায় তোমরা বুঝি ন্যাও নিজের অদিকার[২] ॥
ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে ॥
এক বেলা তোমার অন্ন জুটে[৩] পেন্দোনং[৪] তোমার কাপড় কোণ্টে[৫]
হায়রে হায় খালি কইরচেন নেংটি সর্বসার ॥
ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে ॥
তোমার হাতোত[৬] ভাইরে কোদাল কাঁচি
তবু প্যাটোত[৭] পাথর বান্দি আচেন বাঁচি
আর তোমরায় জোগান ভাত সব্বো দুনিয়ার ॥

শব্দার্থ ১—খোঁজার জন্যে, ২-অধিকার, ৩-জোটে, ৪-পরার, ৫-কোথায়, ৬-হাতে, ৭-পেটে।

বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন গান্ধীজী, তাঁর লবণ তৈরী আন্দোলনে ডাণ্ডি অভিযান এক ঐতিহাসিক পদযাত্রা। স্বরাজের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'স্বরাজ্য দল'ও আহ্বান জানায় বিলাতী দ্রব্য বর্জনের। এই ডাকে সারা দিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন নিরক্ষর পল্লী-কবিরাও। ভারতের রাজনীতিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার ঢেউ গিয়ে আঘাত করলো পল্লীবাংলার হৃদয়েও। মুকুন্দ দাসের বাউল সুরে গাওয়া বিখ্যাত গান পল্লী ললনার হৃদয়েও তুলেছিল সুরের আগুন।

('মুকুন্দ দাস' নামে পরিচিত হলেও তাঁর আদি বা আসল নাম যজ্ঞেশ্বর দে। বাবার নাম গুরুদয়াল দে। জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বানারী গ্রামে। ১৯০২ সালে শ্রী রামানন্দ অবধূত হরিবোলানন্দের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর নাম হয় মুকুন্দ দাস। পরবর্তীকালে তিনি মুকুন্দ দাস নামেই পরিচিত হন।) বহুল প্রচারিত হওয়ার ফলে এই গানে দেখা যায় নানা কথান্তর।

(১৬)

ছেড়ে দেও (ভেঙে ফেল) কাচের (রেশমী) চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগো গো ও জননী ও ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না॥

কাচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হাতে প'রো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্মসাক্ষী
জগৎ ভ'রে আছে জানা॥

চটকদার কাচের বালা ফুকের মালা
তোমাদের অঙ্গে শোভে না।
বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে
কোটি টাকার কম হবে না॥

পুঁতি কাচ ঝুটো মুক্তোয় এই বাংলায়
নেয় বিদেশী কেউ জানে না।

ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা
জাগো আমার যত কন্যা ॥
তোমরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন
বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি অভাগিনী কাঙ্গালিনী
দুবেলা অন্ন জোটে না ॥
কি ছিলেম কি হইলেম কোথায় এলেম
মা' য়ে তোরা চিনলি না।*

বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ডাকে চারণ কবির সুরে সুর মিলিয়ে গণ-জাগরণে পল্লী গায়কেরাও দূরে সরে থাকেন নি। অনুরূপ গান তাঁরাও বেঁধেছেন। 'মনোরঞ্জন' ভণিতায় গাওয়া এমনি একটি গান বাংলার আকাশ বাতাস এক সময় মুখরিত করে তুলেছিল, জনগণের মনে জাগিয়েছিল আন্দোলনের তুফান। কেবল কাচের চুড়িই নয়, বিলাতী সমস্ত রকম পণ্য বর্জন করে স্বীয় ধর্ম রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন লোকশিল্পী। সাম্প্রদায়িকতা ভুলে সকলকে এক হয়ে ভারতমাতার দুর্গতি-মোচনে উদাত্ত আহ্বান জানান পল্লীকবি 'মনোরঞ্জন'।

(১৭)

এবার বন্দেমাতরম্ বল সর্বজন।
শুনহে ভারতবাসীগণ।
এবার মহা উৎসবে সবে ডাক মাকে ভক্তিভাবে
তবে তো সুধিবে জীবে এত কার্য সাধন ॥
ত্যাজ বিলাতী বসন, বিলাতী ভূষণ, বিলাতী চিনি ও লবণ
কেহ আর কোরনা গ্রহণ।
এ যে সকল জাতির ধর্ম নষ্ট হতেছে এ কু-ভোজনে
এ সকল অজ্ঞাত পাপ, ধর্ম বই আর কেউ না জানে।

* 'মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে রবীন্দ্রকুমার বসু গানটি মনমোহন চক্রবর্তীর রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। (গীতা চট্টোপাধ্যায়—স্বদেশী গান। ১৯৮৩। পৃঃ ৩২৪)। অন্যত্র আবার এই গানের গীতিকার হিসাবে হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েরও নাম পাওয়া যায়।

ভাই এখনে সবে জেনে শুনে ঘৃণা উপজিল মনে
যে কতদিন আর প্রাণ বাঁচে কোরনা গ্রহণ।
একবার বন্দেমাতরম বল সর্বজন॥

আজ যত হিন্দু মুসলমান সবে হলে ভাই বুদ্ধিমান
রক্ষা করতে চাও যদি ভাই স্বধর্ম সম্মান
এ কাজে যে হয়েছে ব্রতী, ব্রতী হয়ে তার প্রতি
ঘুচাও ভারতের দুর্গতি।

সম্প্রতি হয়ে এ সম্পত্তি জনেতে কোরনা হেলা
দূরে যাবে সকল জ্বালা।
দিও না প্রাচীন হেলায় সেই পাপসাগরে বিসর্জন
এবার বন্দেমাতরম বল সর্বজন॥

আছ যত জ্ঞানী গুণী এবার দেখ মুনি গুণী
আহা মরি আহা মরি কি আশ্চর্য মহিয়সী
যে ব্যাটা আনলো কাচের চুড়ি বলে দিল্লীর দরবার
কি বাহার বাহার মেরে নিল তুলে স্বর্ণ রূপা মণি-মুক্তাহার।

মনোরঞ্জন বলে ভাই এসব নেহাৎ একেবারেই কর পরিহার॥

মিছরী ও লবণ-চিনি সবই দেও বিসর্জন
এবার বদন ভরে বলরে সবাই বন্দেমাতরম॥

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ জমিদারী বন্দোবস্তের দশ-সালা পরিকল্পনার অবসান করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন বাংলার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস, চার্লস। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্বের শর্তে জমিদারগণ জমির উপর স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হওয়ায় সরকারের অনুগত একশ্রেণীর জমিদার পুষ্ট হয় এবং এর ফলে দেশের বৃটিশ শাসকদের শোষণ ব্যবস্থা কায়েম হয়। জমিদার জমির একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ায় কৃষকশ্রেণী আরও শোষণের শিকার হয়, কারণ খাজনা ও চাষ করা ইত্যাদির ব্যাপারে জমিদারের নীতিই আইনরূপে স্বীকৃত এবং জমি থেকে অপছন্দের চাষীকে উচ্ছেদ করা সহজ হয়ে পড়ে।

এর ফলে জমিদারের অত্যাচার সাধারণ মানুষের কাছে এক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়। নানা অন্যায় আর দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক এই জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল সকলেরই কিন্তু জমির একচ্ছত্র মালিক হওয়ায় জমিদারের বিরুদ্ধাচারণ কেউ করতে সাহস পেত না, আর যে সাহস করে বিরুদ্ধাচারণ করতো তাকে জমিদারের আওতা থেকে বিতাড়িত করা হত। এই চরম দুর্নীতি, অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণ সোচ্চার হয়েছে বার বার, আর জনগণের এই সোচ্চার প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছেন বাংলার লোক-কবিগণ। দেশের জনগণকে সার্বিক অবস্থার কথা জানিয়ে চারণ কবির দল জনগণকে হুহুঙ্কারে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ বিদেশী সরকারের ব্যবস্থায় দেশে নানা রকম অত্যাচার, অনাচার, হাহাকার, কালো-বাজারী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই সবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন লোক-কবিরা। যখন সরকারের কোন রকম বিরোধিতা করাই ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তখনও অকুতোভয় লোককবিদের কণ্ঠ রোধ করা যায়নি, যা গিয়েছিল সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে। লোককবি যতীন দাস তখন নির্ভীকভাবে গেয়েছেন—

(১৮)

ও ভাই ছ্যাশের কি দশা হইল ॥
ভারতবাসীর ঘরে ঘরে চাল না যে মেলে
ভাইরে ছ্যাশের কি দশা হইল ॥
আলু পটল কলা কচু বাজারে যে নাই কিছু
সব খাইছে ওই বানর ছুঁচো রইতে নাহি দিল
ভাইরে ছ্যাশের কি দশা হইল ॥
ব্রাহ্মণাদি ভদ্র মুচি সব হইয়াছে এবার শুচি
ভাইবা ছ্যাখেন ভাই মিছামিছি তারা একই হালে চলে
ভাইরে ছ্যাশের কি দশা হইল ॥
বাবু লোকের দফা সারা অন্নাভাবে যায় যে মারা
এখন বলে ওমা তারা তুমি ক্যানে নিদয় হলে
ভাইরে ছ্যাশের কি দশা হইল ॥

যদি বলেন ক্যামন কথা রেশন কার্ড যে পিতা মাতা
কণ্টোলের লাইন ধরলে আর গ্যাশের কি দশা হইলে
অধম যতীন বলে বিনয় করে এই ভারতের ঘরে ঘরে
জেগে উঠুন হুহুঙ্কারে নেমে আসুন দলে দলে
নইলে গ্যাশের কি দশা হইল ॥

ক্রমাগত সোচ্চার প্রতিবাদ এবং জমিদারের অন্যায় ও অনাচারের হাত থেকে সাধারণ মানুষ ও বিশেষতঃ কৃষকদের রক্ষা করার জন্য ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করেন। এই জমিদারী প্রথা তুলে দেওয়ার আগে এক জনমত যাচাই করা হয়, এই মত-যাচাইয়ের প্রসঙ্গে যাতে সকলে একমত হয়ে জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধনের পক্ষে ভোট দেন, সেই গণচেতনা জাগিয়ে তুলতে বাংলার লোক-কবিগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। গ্রামবাসীগণ যাতে সাগ্রহে এই ভোট দিতে এগিয়ে আসেন সেজন্য লোক-কবিগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে গণ-সংযোগ করেছেন গণ-চেতনা বৃদ্ধি করতে।

সরকারের কাজের সমর্থনে গণচেতনা গড়ে তুলতে লোকসঙ্গীত এক গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(১৯)

চল্ চল্ চলরে কিষাণ ভাই
জমিদারী উটিবার[১] তনে[২] ভোট দিবার যাই।
শ্যাষ কইরবার[৩] তনে জমিদারী, জমিদারের নামে করিম শমন জারী
হাখোরাকিয়া[৪] দ্যাশটাক করিম ঠিক, ভিনদ্যাশের[৫] না মাগিম ভিক্
আপনা জমিত ঠাসিয়া ধরিম হাল
বাঙলা দ্যাশের হামারা খেদাইম্ জঞ্জাল।

কৃষককুলকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যেমন একসময় তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল যার ফলে উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ কৃষকের ঘরে উঠতো কিন্তু তাতেও কুচক্রী জমিদারেরা নানা রকম কারচুপি

শব্দার্থ—১-ওঠাবার, ২-জন্যে, ৩-শেষ করার, ৪-হাভাতে বা অভাবী, ৫-অন্যদেশের।

করত, বিশেষত তাদের পছন্দমত চাষীকে দিয়েই চাষ করাত, এতে চাষীর নির্দিষ্ট কোন কাজের সংস্থান ছিল না। এই সব ভাগচাষীকে যাতে জমিদার তার খুশিমত বদলাতে না পারে, বা চাষীকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না করতে পারে সেজন্য পাশ হয় 'অপারেশন বর্গা'। এর ফলে যে চাষী যে জমিতে চাষ করছে তারই অধিকার থাকবে সেই জমিতে প্রতি বছর চাষ করার। এই সরকারী বিধিতে সকলকে সামিল করার জন্যও প্রয়োজন ছিল গণচেতনা বৃদ্ধির, লোককবিরা এদিকেও সজাগ দৃষ্টি দিয়ে ভাগচাষীদের 'অপারেশন বর্গা' অনুযায়ী তার নিজের নাম নথিভুক্ত করার জন্য উৎসাহী করে তোলেন। লোককবি নিবারণ পণ্ডিত রাজবংশী ভাষায় এমনই একটি গান গেয়ে গণ-চেতনা বৃদ্ধি করেছেন।

(২০)

ও কিরে ও হালুয়া[১]
দখল রাখ তুই ভুই দখল ল্যাখাইয়া।[২]
গিরিওয়ালার[৩] ফাসার ফুসুর[৪] তুই য্যানে শুনিস না।
ক্যানে তুই দেকিয়াও দেকিসনা উয়ার তুষমণি কোণা
হাল তুলিবার বুদ্ধি কত তোক মারিয়া।
হালুয়া নাম রেকর্ড হইবে ভুইটা চাষ করিছে যে
নগদ জরিপ নামিবে হালুয়ার নামটা বসিবে
হালুয়া নাম রেকর্ড কর তুই জুট বান্দিয়া[৫] ॥
অ্যাকবার যদি হালুয়ার নাম রেকর্ড ভুক্ত হয়
হালুয়ার নাম পুছা আর নয়, নাই আর উচ্ছেদের ভয়
ব্যাঙ্ক সেলায়[৬] ঋণ জোগাবে তোক ডাকিয়া ॥

শুধু দেশের শাসন প্রণালী সম্পর্কেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব জনকল্যাণমূলক নিয়মনীতির প্রবর্তন করা হয়, সেই সম্পর্কেও জনগণকে সজাগ ও সচেতন করেছেন লোক কবিগণ। রাষ্ট্রসংঘ নারী জাতির কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ পালনের ডাক দেয়। এই নারী-বর্ষ পালন উপলক্ষে

শব্দার্থ—১-চাষী, ২-লিখিয়ে, ৩-জমির দালাল, ৪-ফুসফুস বা কুমন্ত্রণা, ৫-জোট বেঁধে, ৬-ব্যাঙ্কগুলি।

মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান জানান লোক-কবিকুল। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষায় এই নারী চেতনার গান গেয়েছেন নিবারণ পণ্ডিত।

(২১)

মাও[১] বুন[২] ও মা ও বুন,
জুট বান্দো জুট বান্দো মা ও বুন ও।
ধুঁকে ধুঁকে মইরবো কত আর দ্যাশের নারী
চলো সবাই এ্যাকটে[৩] বসি বাইচবার চিন্তা করি।
মজুর কিষাণ মইরচে ধুঁকে কাজ-কামাই[৪] না পাইয়া
মায়ের জাতি মাও বুন মইরচে ঘর কোনাত্ পড়িয়া।
পুরুষ মানষির কামাই নাই মাইয়াক কি খোয়ায়
ছাওয়াক[৫] খোয়াইয়া মাও বুনগিলার[৬] উপাসে দিন যায়।
পিন্দনের কাপড় মিলেনা প্যাটের মিলেনা ভাত
প্যাটের ভুখে ছাওয়া কান্দে কান্দিয়া কাটে দিন-আত[৭]।
নারী সমাজ মইরবে ক্যানে সদায় পুরুষ-ভীতি চায়া[৮]
চলো বাইচবার চিন্তা করি আমরা এ্যাকটে বসিয়া॥

নিপীড়িত জনগণকে বাঁচার লড়াই করতেও ডাক দিয়েছেন পল্লী কবিরা। গণচেতনা বৃদ্ধিতে এই লোক-গানের অবদানও কম নয়। উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানে তারই আভাস—

(২২)

আরে ও মোর বন্দু দরদীয়া।
(বুজি দ্যাক) কাঁয় বানাইল তোমাক্[৯] নবীন বাউদিয়া।
কোন দোষত্ গেইল্ তোর ভিটামাটি
ব্যাচেয়া খাইলেক কুল্লে গয়নাগাঁটি
কোন দোষত্ শেষ থালাবাটি খাইলেক তুই ব্যাচেয়া॥

শব্দার্থ—১ মা, ২-বোন, ৩-একত্রে, ৪-কাজকর্ম, ৫-ছেলেকে, ৬-বোনগুলির, ৭-দিনরাত, ৮-পুরুষের দিকে চেয়ে অর্থাৎ পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে, ৯-তোমাকে।

কাঁয় হরিল্ তোর খ্যাতের ধান কাঁয় কাড়িল্ তোর মুকের[১] গান
দোশমনক্ তুই না রাখিলুঁ চিনিয়া ॥
ওই পূর্ণ গোলাডা পূর্ণ হইল্ হাজার ভিটা শূন্য হইল্ রে
বুজি ছ্যাক কাঁয় তোর বুকের রক্ত খাইলেক চুষিয়া ॥
কি আছে তোর ভয় ডর বাঁচির বাদে[২] লড়াই কর রে
মরবি যদি মরি যা তুই বাঁইচবার লড়াই করিয়া ॥
যাঁয় তোমাক্ নিত্তি মারে মুকের গ্রাস হরণ করে
মুল দোশমনক বিনাশ কর তুই মরণ কামড় দিয়া ॥

প্রতিনিয়ত শোষিত হতে হতে কৃষককুল একসময়ে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে, ঝড় ওঠে বাঁচার লড়াই করার। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যারা যোগায় সারা দেশের অন্ন, তাদের ঘরেই চির অভাব, নিরন্নের অনবরত ক্রন্দন। নিজের ঘাম ঝরানো ফসল ওঠে মহাজনের গোলায়, অন্যদিকে, হাহাকারে দিন কাটায় অভাবী কৃষককুল। এই অবস্থার প্রতিবাদে জনগণকে সোচ্চার করে তুলতে লোককবিগণও এগিয়ে এসেছেন বার বার, অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হওয়ার জন্য উদ্দীপ্ত করেছেন কৃষককুলকে। এই প্রতিবাদী গানে এক গণ-চেতনার বাণী বয়ে এনেছেন নিবারণ পণ্ডিত।

(২৩)

আরে ও দেশবাসী, আরে ও গরীব চাষী
জীবনভর হাল বাইলাম কাল কাটাইলাম নিত্য উপবাসী ॥
(মোরা) ম্যাগে ভিজি ঔদে[৩] পুড়ি ফসল ফলাই সোনা
ভাইগ্যবানে[৪] সেই ফসল খায় আমরা উপাস উনারে ॥
শাওণ ভাদ্রে ফলাই ফসল অঘ্রাণ পৌষে তুলি
ফাগুন চৈতে মহাজন আসি ভাণ্ডার করে খালি রে ॥
ঝড় বাদলে ভিজি মোরা থাকি ভাঙা ঘরে
ভাইগ্যবানের দালান ওটে[৫] চাষীর ভাইগ্য না ফিরে ॥

শব্দার্থ—১-মুখের, ২-বাঁচার জন্য, ৩-রোদে, ৪-ভাগ্যবানে ৫-ওঠে।

আগের চেয়ে বরং বেশী খাটচি দিবারাত্তি
ইলেকট্রিক কোথায় রইল জ্বলেনা কেরোসিন বাত্তি।
কুমরণ আর মইরবো কত চল মরার মত মরি
বাঁচার লড়াই করি সবে ঝাণ্ডা উচা করি ॥

সাধারণ মানুষের দুঃখে সমাজ সচেতনতাও জাগে না, ফলে অভাবী জনগণ তাদের অভাবের আর শোষণের জ্বালায় নিষ্পেষিত হয়। নিজেদের অবস্থা নিয়ে তাই নিজেদেরই সংগ্রাম করার ডাক দিয়েছেন লোক-কবিরা। অন্য কোন মাধ্যম নয় কেবল লোক সাংবাদিকতার গানই জনগণের মনের ব্যথা তুলে ধরে সকলকে সংগ্রামে ব্রতী হতে আহ্বান জানান।

(২৪)

দরদী মোর বাই[১]
চল করি চল বাঁইচবার লড়াই।
দিনে আইতে[২] খাটিয়া মরি চিন্তিয়া কাটাই রাত
ওরে মাইয়া ছাওয়ায় রুটি চাবাই না পাই প্যাটের ভাত।
অমিলন নয় কোন জিনিসের সব জিনিসই মিলে
হাট বাজারেই সব পাওয়া যায় ডবল মূল্য দিলে।
ভাইগ্যবানের বোঝা দেখরে ভগমানেও[৩] বয়
(ওরে) গরীব চাষীর বোঝা বইবার দরদী কাঁও নাই ॥
ধনীর কান্দন ধনীরে কান্দে আর কান্দে ভগমানে
(ওরে) সরকার কান্দেন মায়া কান্দন মোর কান্দন কাঁয়[৪] শুনে রে ॥
কাক মরিলে কাকেরে কান্দে জুটে[৫] এক জায়গায়
ওরে গরীব মইরছে গরীব ভাই সব আয়রে ছুটে আয়।

স্বাধীনতার পর দেশে শুরু হয় নানা রকম দুর্নীতি ও অন্যায়-অবিচার। অনাহারে যখন সাধারণ ভারতবাসী মৃত্যু বরণ করছে তখন কিছু সংখ্যক লোক নানা অনাচার, দুর্নীতি ও অত্যাচার করে শোষণ করেছে অসহায়

শব্দার্থ—১-ভাই, ২-দিনে-রাতে, ৩-ভগবান, ৪-কে, ৫-জোটে (একত্রিত হয়)।

গরীবদের। এই সামাজিক অবস্থার চিত্ররূপ সর্বত্রই এক। গ্রামের ভাবুক কবি শিল্পীগণ তাই সোচ্চার হয়েছেন এই অবস্থার বিরুদ্ধে জনজাগরণে জন-চেতনার উন্মেষ ঘটাতে। এমনকি মানভূমের লোককবি ধ্রুবপদ মাহাতোরও দৃষ্টি এড়ায়নি এই অব্যবস্থার প্রতি, তাই তো তাঁর গাওয়া গণচেতনার গানে ফুটে ওঠে তৎকালীন সমাজচিত্র।

(২৫)

এই কি স্বাধীন দেশ।

পথের ধারে অনাহারে গরীবের হয় জীবন শেষ ॥
লক্ষ লক্ষ জীবন দিয়ে সহিয়ে অশেষ ক্লেশ
এসেছে ভারতে স্বরাজ নেতারা আজ সুখী বেশ ॥
শাসকের অনাচারে অনশনে শীর্ণ বেশ
ছেঁড়া কাঁথা মলিন বসন তেল বিহনে রুক্ষ কেশ ॥
ওঠো জাগো গরীবের দল মানুষ তোমরা নও তো মেষ
দূর করো এই বিষমতা গড়ো নতুন পরিবেশ ॥

যুদ্ধকালীন দুর্নীতি ও কালোবাজারীদের হাত থেকে সাবধান হওয়ার জন্য দেশবাসীকে সজাগ করে দিতেও লোক কবিদের অবদান কম নয়। গণচেতনা বৃদ্ধিতে এই সব লোকসঙ্গীত লোক সাংবাদিকতার ভূমিকা পালন করেছে। সংবাদপত্র যে ভূমিকা পালনে সহসা তৎপর হয় না, লোক কবিগণ সেখানে অকুতোভয়ে জনগণকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন। বাউল সুরে গাওয়া এমনি একটি লোকসঙ্গীত—

(২৬)

হায়রে কেন ঘুমিয়ে র'লে
জেগে দেখ তোর ঘরে সিঁদ কেটেছে চোরের দলে।
আর বা কত ঘুমিয়ে রবে
ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগতে হবে
নইলে তোর সবই যাবে বুক ভাসাবে নয়ন জলে ॥

যাবে রে তোর ভিটামাটি
জেগে শোন ওই কান্নাকাটি
হায় কি হইল সবাই বলে ॥
ধনে জনে হরণ করি
উজাড় করে ভিটা বাড়ী
চোরেরা সব আরাম করি ভরছে ভরা তলে তলে।
সুখ পাবে না মইর‍্যা গিয়া
হবে না তোর মরণ ক্রিয়া
চোরেরা সব কাপড় নিয়া লুকাইয়াছে গুপ্তস্থলে ॥

যুদ্ধকালীন কণ্ট্রোলের দৌলতে হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা আর সুযোগ সন্ধানীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান লোককবি নিবারণ পণ্ডিত। গণচেতনা বৃদ্ধি না করতে পারলে এইসব হঠাৎ ধনী ব্যক্তিদের মুখোশ খুলে দেওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় এই সব কালো-বাজারীর দুর্নীতি দমন। চারণ কবির ভূমিকায় লোক-কবিরাও পথে পথে একসময় এই সব দুর্নীতি-পরায়ণ লোকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।

(২৭)

চিনে রাখো গাঁয়ে তোমার কে কে নতুন মাতব্বর
কার বাড়ীতে যায়রে রাতে লবণ চিনি তেল কাপড় ॥
কোন মাতব্বরের পুত্রধনে, তামাক খায় না চুরুট টানে
হাল ফ্যাসানে চা'র দোকানে আড্ডা মারে বরাবর।
কি হালে সে চলে এখন পৈত্রিক সম্পদ ছিল কেমন
কয়টি কইরছেন পুকুর খনন কয়টি বানছেন টিনের ঘর।
কিবা কাজ করতেছেন তিনি, বিদ্যার দৌড় বা কতখানি
কয় জেনানা রাখছেন তিনি, কয়জন রাখছেন সহচর
খোঁজ কর ভাই কোন কোন শয়তান এদের সাথে দেয়বে যোগাড়,
কোন বাজারে হয়রে চালান লবণ চিনি তেল কাপড় ॥

আর খোঁজ কর পরে তিনি কয়দিন ছিলেন হাজত-ঘর
কোন মার্জায় অপরাধ করে গেছলেন তিনি বাসর-ঘর ॥

সরকারী প্রচেষ্টায় বয়স্ক শিক্ষার প্রচলন করা হয়েছে, বিশেষতঃ গ্রাম অঞ্চলে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে বয়স্ক ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার অভাবে এতকাল যে মানুষেরা জমিদার ও জোতদারের বেগার-খাটা মনিষ হয়ে কাজ করেছিল তারা শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে প্রকৃত হিসাব বুঝে নিতে পারবে এই আশায় বয়স্ক শিক্ষাক্রমে জনগণকে আগ্রহী করে তুলতে লোক-কবিরাও সচেষ্ট হয়েছিলেন। বীরভূম অঞ্চলে এমনি এক ঝুমুর গানের আসরে লোকশিল্পী গেয়ে উঠলেন বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীতার কথা। আশানন্দন চট্টরাজের সংগৃহীত গানটি জনজাগরণের অন্যতম নিদর্শন—

(২৮)

বুড়াকালে লিখাপড়া শিখবো তাতে লাজ কিসে
তুমিই বল ও পিসে[১]।
বল বল ভেবেই বল বসেই বল মজলিসে ॥
তাইতো আখুন[২] সঞ্জে[৩] হলেই বুলি তুমার বৌমাকে
দেগো হামার বই পেনসিল ত্থাক আছে তো ঘর তাকে।
ছিলাকেও[৪] বলি হেঁকে, আয়রে বিটা ছিলেট[৫] দিসে
শিখবো তাতে লাজ কিসে ?
সঞ্জে বাউরলে[৬] যিয়ে[৭] ত্থাখো, এই গাঁয়র আটচালাতে
মুংলা মাঝি কাসেম কানাই, বই খুল্যাছে এক সাথে।
আঁক কইষছে আজম চাচা আর বাসুদেব দাস
বুধন সরেন নাম সই কইরছে বসি তারই পাশ।
শুনবে ম্যাস্টারদা বুইলছেন[৮] উখানে
পড় ভাই মিলে মিশে ॥

শব্দার্থ—১-পিসেমশাই, ২-এখন, ৩-সন্ধ্যে, ৪-ছেলেকেও, ৫-শ্লেট, ৬-সন্ধ্যা আরম্ভ হলে, ৭-গিয়ে, ৮-বলছেন।

ঘ. প্রতিবাদী লোকসঙ্গীত

লোক-সাংবাদিকতার প্রতিবাদী গান অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনেক বেশি সোচ্চার। এখানে কেবল গণচেতনা নয়, জনগণকে সঙ্গী করে বা একক ভাবেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন লোক কবিগণ। এই প্রতিবাদী গান রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সর্বক্ষেত্রেই প্রসারিত। লোক-কবিরা একদিকে যেমন বিভিন্ন জনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন তেমনি সরকারের প্রবর্তিত নীতিরও প্রতিবাদ করেছেন জনগণের মুখপাত্র হিসাবে, তাদেরই নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে।

জলপাইগুড়ি জেলার 'বেরুবাড়ী' অঞ্চল পাকিস্তানকে দেওয়ার যে চুক্তি করেন ভারত সরকার ১৯৬০ সালে, তারই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে জলপাইগুড়ি অঞ্চলের মানুষ এবং তাদের মুখপাত্র হিসাবে লোককবিরা তাঁদের গানের পসরা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, প্রতিবাদের ভাষায় উদ্দীপ্ত হয়ে।

(২১)

মূলগায়েন : আসরেতে খাড়া হয়্যা[১] বন্দিম এ লোক কাক[২]
ঘ্যাশের হালত্[৩] দেখ্যা হইচুরে[৪] আবাক।
মরি হায়রে কলিকাল—
বেরুবাড়ী দিবার নাগে[৫] নাগ্যাচে ক্যাচাল॥

সমস্বরে : বেরুবাড়ী দিম্ না[৬] বেরুবাড়ী দিম্ না।
বেরু দিম বাড়ী দিম বেরুবাড়ী দিম্ না
জান দিম পাণ দিম বেরুবাড়ী দিম্ না॥

মূলগায়েন : খাজলা[৭] খাবার চাছিস গিথানী[৮] মুই ক্যামনে পামু গুড়
বেরুবাড়ী যায় পাকিস্তানত্ মুই কি হছুঁ চুর[৯]
পাটানী পিন্দিবার চাছিস্ গিথানী পাটানী পামু কই
বেরুবাড়ী যায় পাকিস্তানত্ হামি কি চুপ করিয়া রই॥

নারী : যাওরে কুকিল উড়্যা হামার বাপোক্ গিয়া কভা
তোমার বেটি-ছাওয়া[১০] মরছুরে হায় নদীত গিয়া ডুব্যা
ডাঙ্গর মাইয়া বিয়া দিতে বেরুবাড়ী নাগে।

শব্দার্থ– ১-দাঁড়িয়ে, ২-কাকে, ৩-অবস্থা, ৪-হয়েছি, ৫-জন্যে, ৬-দেবোনা, ৭-খাজা, ৮-গৃহিনী, ৯-আমি কি চোর হয়েছি, ১০-মেয়ে।

মূলগায়েন : হায়রে হায়, হায়রে দারুণ বিদি[১]
বেরুবাড়ীটার ক্যাচাল[২] ছাড়াক বিদি
হামার ঘর না করিস আইন্দা[৩] ॥

সরকারী বিধি-নিয়ম দেশের জনগণের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ না হলেই তা নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন লোক-কবিগণ। বেরুবাড়ী হস্তান্তরের যেমন প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, তেমনি প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে সরকারের স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নেও। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের ফলে দেশের অসংখ্য স্বর্ণকার ও স্বর্ণ শিল্পীগণ চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হন, কারণ স্বর্ণালঙ্কার তৈরী করে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁদের সকলেরই জীবিকার অভাবে অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়তে হয়। এমতাবস্থায় স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরোধিতা করে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন লোক শিল্পীগণ। গণ মাধ্যমের সম্পাদকীয়তে যে প্রতিবাদ জানানো হয় মৃদু কণ্ঠে, গণশিল্পীগণ সেই প্রতিবাদই জানান অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে। নিবারণ পণ্ডিত এখানেও তাঁর বক্তব্য রেখেছেন সোচ্চারে।

(৩০)

ও আমার দ্যাশের কথা বলব কি তা শোনরে সাধু ভাই
ও হেতায় বুদ্ধিমানের রাজত্বেতে বলার কিছু নাই।
ও ছিল সোনার অলঙ্কার ও তায় পিতল দিয়া দেয়
সোনারূপা কাড়িয়া নিয়া শেষে পিতলে চোখ ধাঁধায় ॥
কত লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিল সোনার কারিগর
নয়া আইনে কাবু হইয়া হইল দিগম্বর।
বেকার হইল কর্মকার, হইল শরীর চর্মসার ॥
ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া আর্সেনিকে[৪] দেয় চুমুক
অধম নিবারণ কয় বিনয় করি সরকার মশাইর চোখ খুলুক।

ভারত সরকারের সেন্সার প্রথার চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে লোক-কবি নিবারণ পণ্ডিত তার একটি গানে চরম প্রতিবাদ জানান। আভ্যন্তরীণ জরুরীকালীন

শব্দার্থ—১-বিধি বা বিধাতা, ২-ঝগড়া বা ঝামেলা, ৩-অন্ধকার, ৪-আর্সেনিক বা বিষ।

অবস্থায় ১৯৭৫ সালে আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' গানটির প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়, এই মূর্খতাকে ব্যঙ্গ করে সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদে গর্জে ওঠে নিবারণ পণ্ডিতের কণ্ঠস্বর, যদিও শারীরিক কারণে তখন তার স্বর-গ্রাম নিচু হলেও কাব্যের দাবীতে তা অতি উচ্চস্তরের শ্লেষ ও ব্যঙ্গে পূর্ণ।

(৩১)

মুর্খ্যু গীদাল হামরাগিলা ভাওয়াইয়া গান গাই
হালবাড়ীর[১] কামাই সারি দোত্‌রা ভাঙ্গাই[২]।
সুখ দুঃখের কাথা যেলায়[৩] মনোত্‌ পড়িল্‌
চটকা সুরে দোত্‌রা ডাং বাজিয়ারে উঠিল্‌॥
স্বাধীন হইনু ঘর হারাইনু নাই আর ভিটামাটি
পরার ভূয়ত্‌[৪] ঘর বান্দিয়া পরার ভূইয়ত্‌ খাটি॥
দিনমানে সেই আড়াই ট্যাহা মুজুরী পাইয়া
মাইয়া ছাওয়ায় রুটি চাবাই আন্দারত্‌ বসিয়া॥
হামি হয়তো মইর‍্যা যাইম্‌ ভাই বাচিম্‌ না বেশি দিন
ডাগ্দার বাবু কইছেন হৃদ্‌রোগ বড়ই কঠিণ।
গান কবিতা বন্ধ হইল্‌ মোর আসর করা মানা
ক্যামন করি গান করি ভাই হইল্‌রে ভাবনা॥
ভাবিনু না হয় ছাপি দিম্‌ মুই গান দুচারখানা
সেন্সারে কাটিয়া গানের ভাব রাখিল্‌ না।
মনের আগুন চক্ষের জলে নিভানোর কথাখানা
সেন্সারে কয় আগুন শব্দ বলারে চলিবে না॥
'আগুন' বাদ দিয়া শুধু জল দিয়া কি কইর‍্যা গান গাই
ভাবে বুঝিনু দুঃখ পাইলেও বইল্‌বার[৫] উপায় নাই।
হামার গান তোমরায় ভাইরে সাঙ্গ ধরি নিও
সময় আইলে আগুনে-গান হাজারো কণ্ঠেত্‌ গাইও॥

তবু এই সেন্সার প্রথাকে অগ্রাহ্য করেই বাংলার লোককবি তাঁদের প্রাণের

শব্দার্থ—১-কৃষি জমির, ২-দোতারা বাজাই, ৩-যখনই, ৪-পরের জমিতে, ৫-বলার।

কথা সোচ্চারে বলেন। এর ফলে অনেক সময়েই এই সব চারণকবিকে রাজরোষের শিকার হতে হয়, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ হয়না, জনগণের প্রাণের কথা সোচ্চারে ভেসে আসে গানের কলিতে।

"লোক-কবিরা শহরের মেকী সভ্যতার ধার ধারে না। বিজলী বাতি আর কলের জল চোখে দেখেনা। সংবাদপত্র আর বেতারের ওজন করা কথার সঙ্গেও তারা পরিচিত নয়, একথা ঠিক! কিন্তু তাদের গণ-চেতনা তথাকথিত বাবু ভুইঞাদের চাইতে যে কিছুমাত্র কম নয় এ পরিচয় আপনারা শুধু টুসু গান কেন বাংলার অধিকাংশ লোক-সংগীতের মারফৎই পাবেন। এই সব গানই হল নিরক্ষর পল্লীবাসীদের সংবাদপত্র—এর মারফৎ তারা তাদের মত গঠন করবার সুযোগ পায়।"[১]

লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে লোক-শিল্পীরা শুধু জনমত গঠন করাই নয়, তাদের গানের মধ্যেই ফুটে ওঠে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। মানভূমে বাংলা ভাষার পরিবর্তে জনসমাজের উপর জোর করে অন্য ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে মানভূমের 'টুসু' গানের মধ্যেও এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

"দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার।" এই গানটির পূর্ণাঙ্গ রূপ মানভূম অঞ্চলের লোক-কবিদের কাছ থেকে সংগৃহীত।

(৩২)

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে ?
বাংলা ভাষারে ॥

এই ভাষাতেই কাজ চলেছে সাত পুরুষের আমলে।
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে মুখ ফুটেছে মা বলে ॥
এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড এই ভাষাতেই চেক কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি সাত পুরুষের হক পাটা ॥
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি ভাষার চির অধিকার।
দেশের শাসন অচল হবে ঘটবে দেশে অনাচার ॥

১। চিত্তরঞ্জন দেব—বাংলার পল্লীগীতি। ১৯৬৬। পৃঃ ১২৭

রাজনৈতিক ভাগাভাগির সময় মানভূম জেলাকে বিহারের অন্তর্গত করার বিরুদ্ধে জনচিত্তে আন্দোলন ওঠে। এই অঞ্চলে বাংলা ভাষায় পঞ্চায়েতী-রাজ প্রতিষ্ঠার সমর্থনে এবং হিন্দী ভাষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে লোককবিরা গর্জে ওঠেন। এতদঞ্চলের জনগণের মনের ভাষা প্রকাশ পায় লোকসঙ্গীতের অগ্নিক্ষরা কলিতে।

(৩৩)

মোরা বেঁচে আছি আশাতে
বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষাতে।
পঞ্চায়েতের শাসন হলে মানভূমি বাংলাভাষী
গাঁয়ের ভাষায় রাজ চালাবে মাথা হবে গাঁ-বাসী
বাংলা ভাষায় চললে শাসন চালকেরা পালাবে
গাঁয়ে ঘরে গরীব দুখী ঘরের শাসন চালাবে॥
এই ভাষাতে কাজ চলে তো চোখ খুলিবে সহজে
ফন্দি এঁটে হিন্দী লিখে ঠকাবে না কাগজে।
এই ভাষাতেই শক্তি মোদের পঞ্চায়েতী শাসনে
বাংলা জ্ঞানে জিনবো মোরা সবার সমান আসনে॥
মোরা বেঁচে আছি আশাতে
বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষাতে॥

মানভূমের বাঙালী অধিবাসীদের বাঙলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবী দীর্ঘদিনের, কিন্তু রাজনৈতিক ভাগ-বাঁটোয়ারায় মানভূম জেলাকে বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, অধিবাসীদের দাবী উপেক্ষা করে। পরবর্তীকালে যেহেতু মানভূম বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয় সেজন্য সেখানকার জনগণের উপর হিন্দী ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয় জোর করে, ফলে সেখানে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। বিহার সরকার এই ভাষা-আন্দোলন দমনের জন্য নানা অত্যাচার চালায় এমনকি বাংলা ভাষার আন্দোলনকে 'হিন্দী বিরোধী আন্দোলন' আখ্যা দিয়ে দমন ও বিভেদমূলক রাজনীতি চালায়। এরই প্রতিবাদে মানভূমের লোকশিল্পীগণ সোচ্চার হন তাঁদের গানের মাধ্যমে।

জনজাগরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে এই গান প্রতিবাদে মুখর হয়ে কণ্ঠে। গণচেতনা বৃদ্ধিতে এবং প্রতিবাদে মুখর হতে সংবাদপত্রের যে ভূমিকা থাকার কথা ছিল তারই দায়িত্ব নিয়ে লোকসঙ্গীত সাংবাদিকতার কাজ করেছে। ১৯৫৫ সালে মানভূমের টুসু পরবে ঘরে ঘরে এই প্রতিবাদী গান মুখর হয়ে ওঠে। ভজহরি মাহাতোর কণ্ঠে তারই নমুনা—

(৩৪)

শুনরে বিহারী ভাই—
তুরা রাখতে লারবি ডাং দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই॥
ভাইকে ভুলে করলি বড়, বাঙালী বিহারী বুদ্ধিটাই॥

বাঙালী বিহারী সবাই, এক ভারতের আপন ভাই
বাঙালীকে মারলি তবু বিষ ছড়ালি হিন্দী চাই।
বাংলা ভাষার দাবীতে ভাই কোন ভেদের কথা নাই
এ ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে মাতৃভাষায় রাজ্য চাই।

'টুসু' তো বাঙালীর তুষ-তুষালীর বা তোষলা দেবীরই অপর নাম। তাই বাংলা ভাষাভাষী জনগণ যখন রাজনৈতিক পাকচক্রে হিন্দী ভাষীদের অন্তর্গত হয়ে যায় তখন তার বিরুদ্ধে জাগে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। যেমন 'টুসু' গানের একদলের নেত্রী তাই অন্যদলের নেত্রীকে আক্রমন করেন টুসু পরবের জাগরণের রাত্রে গানের আসরে—

(৩৫)

ও তুই চল্যা যা মানে মানে
রইতে নারি তোর অনাচারে॥
অনাহারে লোক মরিল হুড়াপুঞ্জার গ্রামেতে
এক কলমেই লিখে দিল সবাই ভিখারী বটে।
মাতৃভাষার টুটি টিপ্যা উঠালো আদালতে
তাইতো ইখন চায়না রে মন অনাচারে রইতে॥

১৯৫১ সালের ২১ শে এপ্রিল কোচবিহার জেলার ভুখা মিছিলের উপর গুলিচালায় পুলিশ বাহিনী। সাত বছরের শিশু সহ পাঁচজন এই গুলিতে প্রাণ হারায়। এই নারকীয় ঘটনার সমবেত প্রতিবাদের ধ্বনি ফুটে ওঠে লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের গানে। তিনি 'উমাচরণ চক্রবর্তী' ছদ্মনামে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান 'খাদ্যের বদলে গুলি' শীর্ষক লোকগানে। লোক সাংবাদিকতার ভূমিকা পালনে এ এক জলন্ত প্রতিবাদী গান।

(৩৬)

সাতই শনিবারে—
সাতই শনিবারে দ্বিপ্রহরে ভুখা ভারতেরে
খাদ্যের বদলে গুলি দিল সাগর দিঘীর পাড়ে।
হইল হতাহত অন্যায় মত একচল্লিশ জন
পাঁচজন হইল শহীদ যখন তখন।
কবিতা প্রথমে মরে তারপরে সঙ্গী হইল তার
সতীশ বাদল বন্দনা আর বকুল তালুকদার।
শিশু সাত বছরের বকুলের হইল মরণ
ভ্রাতার সাথী হইল ভগ্নি বন্দনা তখন।
কংগ্রেসী বিধান ভাল আরও ভাল বিধান সরকার
পত্রিকাতে ঝুটা সংবাদ করেছেন প্রচার।
ইহা পঞ্চাশ সন নয় —।
ইহা পঞ্চাশ সন নয় তার পরিচয় দিয়াছেন জনতা
ভুলেন নাই পঞ্চশহীদ ভাই ভগিনীর কথা।
সভা মিছিল ক'রে—।
সভা মিছিল ক'রে পষ্ট ক'রে কর‍্যাছে ঘোষণা
ভুখা কণ্ঠ বুলেট দিয়া দমানো যাবে না॥

দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারনার বহির্ভূত কোন নতুন প্রথা প্রবর্তন করলে যদি সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেনি সাধারণ জনগণ। আন্তর্জাতিক মানে হিসাবে সুবিধার জন্য সরকার ১৯৫৭ সালে

দশমিক মুদ্রা ও দশমিক প্রথায় ওজন প্রবর্তন করলে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে জনসাধারণ নানা বিভ্রান্তিতে পড়ে একারণ কেউই প্রথমে এই-প্রথাকে স্বাগত জানায় নি, লোককবির দলও এই দশমিক প্রথাকে সমর্থন না করে বরং সরকারী মুদ্রা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। জনৈক 'জগন্নাথে'র ভনিতায় এমন একটি লোকগীতি তখন প্রচলিত ছিল গ্রামে গঞ্জে—

(৩৭)

স্বাধীন ভারতে নতুন পয়সা হবে গুণিতে
যত আছে মূর্খ লোক, তাদের হইল দুঃখ
এইবার হাট-বাজার পারিবে না করিতে ॥
ষোল আনা ছিল জানা, সেটা করিল মানা
একশ পাইসায় অ্যাক টাকা পারিবে কি গুণিতে ॥
লেখাপড়া কর সবাই, চিনিবে গো একলাই
এই ভারতে লেখাপড়া হবে এবার শিখিতে।
এক দু-আনা ভাঙ্গিলে, টাকাই আনা যায় চলে
ঐ রাগে যাও স্কুলে বলিছে জগন্নাথে ॥

প্রাচীন মুদ্রার হিসাবের সঙ্গে দশমিক মুদ্রার বিনিময় হারের ব্যবস্থাতেও যে গড়মিল দেখা যায়, তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাতে লোকশিল্পীরা সরব হয়েছিলেন। এই ধরনের আরও একটি লোকগীতি তখন প্রচলিত ছিল নানা স্থানে।

(৩৮)

ভাইরে নয়া পয়সা হইল চালু
এই না সোনার দেশে।
টাকা ভাঙ্গালে ষোলো আনা
সকল লোকই জানে।
নয়া পয়সার দৌলতে ভাই
নব ধারাপাত মেলে।

বিনা হিসাবে ট্যাকসো যায়
সরকারের গ্যাঁড়া-কলে ॥
স্বাধীন দেশের আজব কথা
কইতে লাগে ভয়।
এক আনায় ছয় পয়সা হইলে
তিন আনায় উনিশ ক্যানে হয় ॥
এসব ভেল্কীবাজি রাহাজানি
দুপুরে ডাকাতি
সরকার বাহাদুর পয়দা করছে
নূতন বেসাতি ॥

লোক-সাংবাদিকতার অন্যতম ধারক গুরুদাস পাল তাঁর গণ-জাগরণের গানের ফলে ১৯৪৮-৪৯ সালে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সেখান থেকে পালিয়ে এসে তিনি 'সনাতন মণ্ডল' ছদ্মনামে গান লিখে জনগণকে শাসক শ্রেণীর অন্যায় অত্যাচারের কথা বলেছেন সোচ্চারে। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সাধারণ মানুষের বুকে তুলেছে শাসকশ্রেণীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও প্রতিবাদের ভাষা।

(৩৯)

শুনেছো কি কইলকাতার খপর ?
বুদ্ধদেবের শিষ্য যারা, অহিংসাতে মাতোয়ারা
ধরলো পেশা মানুষ মারা, বন্ধ করে ঘরের দোর।
নির্বিচারে নরনারী ছাত্রছাত্রী হত্যা
এ যদি হয় শিশু রাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
তাহলে আজ সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী ॥

ঙ. প্রাকৃতিক বিপর্যয়

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকে না। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা লোক-কবিদেরও দৃষ্টি এড়ায় না, তাঁদের গানের মধ্যেই এই অবস্থার কথা ফুটে ওঠে। দেশের যে কোন স্থানের অবস্থার কথাই লোক-সঙ্গীতে ধরা পড়ে, লোক-সাংবাদিকতার এটাই বৈশিষ্ট্য।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা অন্যতম। এই বন্যায় দেশের কি অবস্থা হয় তা নিয়ে উত্তরবঙ্গের লোককবি গম্ভীরা গানের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন। এই গানে মূলতঃ শিবকে উদ্দেশ্য করেই তাঁদের সব গানের কথা, যদিও শিব এখানে নিমিত্তমাত্র, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনাই এইসব গানের মূল বিষয়বস্তু। মালদহ জেলার একটি গম্ভীরা গানে, বন্যার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

(৪০)

ইবার[১] কি খাবা হে বাবা, পুয়াল[২] চাবাও বন্যা
কোন মুলুকের বইন্যা আলো[৩] মোর বাবা হে।
কোন দখ্‌না বাতাস আস্যা হে, মোর বা'জী[৪] হে ॥
আমের গচের[৫] ডাণ্টা খাড়ু[৬]
ভাদই ধানের আশা ছাড়ু
ভাতিয়ার বিল হাতিয়ায় নিল্‌
মোর বাবা হে, মোর বা'জী হে ॥

বন্যার যে প্রবল স্রোত তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় ঘরবাড়ী, গরু বাছুর, এমনকি মানুষজনও। এই বন্যার ভয়াবহ চিত্র ধরা পড়ে লোকসঙ্গীতে। উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীতে বন্যা হলে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, তারই রূপ প্রকাশ পেয়েছে একটি ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে। গানটি লিখেছেন সুনীল দাস, গাওয়াও তাঁরই—

শব্দার্থ—১-এবার, ২-ধানের খড়, ৩-এলো, ৪-বাবাজী, ৫-গাছের, ৬-ডগা বা ডাল খালি।

(৪১)

নদীর বান্ আসিল্ রে—ওরে তিস্তা নদীর বান্
ঘর গিরস্তি[১] মাইয়া ছাওয়া[২] ধরিয়া পলান বন্দুরে ॥
ঢেউ খ্যাকিয়া নাগে ভয় বড় বড় পাক্[৩] ওরে বাপোরে বাপ
উতাল পাতাল করে পানিরে ওরে বাঁচে না পরাণ ॥
কলকলায়[৪] যায় পানি ভাই খাল বন্দর দিয়া
(রে ভাই) বান্দো এবার ভুরা[৫] কমোর বান্দি ছাড় নৌকা রে
পালে খ্যাওরে টান্ ।
আর কত মড়া চিনা কাঁও যায় ডুবিয়ারে
মানুষ গরু ভাসি ভাইরে (ওরে) ডুবিল প্যাটের ধান ॥

জলপাইগুড়ির চক-চুন্নী বা চোর-চূরণীর পালা গানেও নদীর বানে কিভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৫৪ সালে পশ্চিম ডুয়ার্সের এক বিশাল অংশ কালুয়া নদীর বানে ভেসে যায়, চক-চুন্নীর পালা গানের বিষয় বস্তুই বন্যার সেই ভয়াবহতা প্রকাশ করে—

(৪২)

গে চুরণী[৬] গে— ।
তেরশো একষট্টি সালে ভাদর মাসের দুই পোহরে[৭]
কালুয়া নদীত বানা[৮] আসিল্ গে ।
খানা ভেত্তির[৯] তামাম[১০] জল কালুয়াত্ আসিল্ গে
হাজীর বাড়ি মজিদ তামাম ভাঙ্গিল্ গে
হাজী ব্যাটা পাজী হয়্যা মোক চোর-ক[১১] দিলেক ধরায়ে
অ্যালায়[১২] হাজীর বাড়ি ভাঙ্গিল গে
বড় মিঞার কন্ঠলের[১৩] তলাত খপড়া[১৪] বান্দি আছে গে
গে চুরণী গে
তেরশো একষট্টি সালের ভাদর মাসে

শব্দার্থ : ১-গৃহের সামগ্রী, ২-ছেলে মেয়ে, ৩-নদীর জলের ঘূর্ণী, ৪-কলকল করে, ৫-কলা গাছের ভেলা, ৬-চোরের স্ত্রী, ৭-দ্বিপ্রহরে, ৮-বান বা বন্যা, ৯-নালা ভর্তি, ১০-সমস্ত, ১১-চোর বলে, ১২-এখন ১৩ কাঁঠালের, ১৪-চালাঘর ।

কালুয়া নদীত বানা আসিল্ গে
ধনীরাম বাবুর বাড়ি বানাত্ নদী খাইল্ গে
অ্যালায় বানাইসে[১] থানা খপড়া বান্দি বটের তলাত[২] গে
গে চুরণী গে, কালুয়া নদীত বানা আসিল্ গে ॥

প্রকৃতির অপূর্ব খেয়ালে যে অঞ্চল একবার বন্যায় প্লাবিত হয়, সেই অঞ্চলেই আবার অনাবৃষ্টিও ঘটে। প্রাকৃতিক রোষে জমির ফসল ফলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে বিশেষতঃ যেখানে জল সেচের ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের জন্যে পড়ে হাহাকার। এই অবস্থার চিত্ররূপ লোকসঙ্গীতেও ফুটে ওঠে। লোকসঙ্গীত শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া একটি জনপ্রিয় গান—

(৪৩)

ব্যালা দ্বিপ্রহর ধু ধু বালুচর
ধূপেতে[৩] কলিজা ফাটে পিয়াসে কাতর
আল্লা ম্যাগ[৪] দে পানি দে ছায়া দেরে তুই
ও আল্লা ম্যাগ দে ॥
আসমান হইল টুডা ফুটা জমিন হইল ফাডা[৫]
ম্যাগরাজা ঘুমাইয়া রইচে পানি দিব কেডা।[৬]
আলের গরু বাইন্দা গিরস্থ মরে কাইন্দা
ঘরের রমণী কান্দে ডাইল খিচরী রাইন্দা ॥
আমপাতা লড়ে চড়ে কাডল[৭] পাতা ঝরে
পানি পানি কইরা বিলে পানি-কউরী[৮] মরে।
ফাইট্যা ফাইট্যা রইচে যত খাল বিল নদী
জলের লাইগ্যা কাইন্দা মরে পঙ্খী জলধি ॥
কপোত কপোতী কান্দে খোপেতে বসিয়া
শুকনা ফুলের কলি পরে ঝরিয়া ঝরিয়া।
আল্লা ম্যাগ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই
ও আল্লা ম্যাগ দে ॥

শব্দার্থ : ১-বানিয়েছে ২-বট গাছের তলায় ৩-রৌদ্রের তাপে ৪-মেঘ ৫-ফাটা ৬-কে ৭-কাঁঠাল ৮-পানকৌড়ি পাখী।

অনাবৃষ্টির জন্য দেশের শস্যহানির কথা এবং এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের দুর্দশার কথা উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার গম্ভীরা গানেও পাওয়া যায়। শিবকে উপলক্ষ্য করে গাওয়া হলেও এই গান গণচেতনার গান, দেশের শাসক-কুলের দৃষ্টি আকর্ষণের গান। অনাবৃষ্টির ফলে দেশের অবস্থার এক সম্যক চিত্র ফুটে উঠেছে এই লোকসঙ্গীতে।

(৪৪)

শিব কি কইরবো হে ইবার বাঁইচবে না পরাণ।
ট্যাহা স্যারের[১] চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেইল্ টান॥
মোগো দ্যাশের আম্র ফলটি স্যেও হইল মাটি[২]
পলু[৩] পুশা[৪] মাছি দিশা দর হইল থাঁটি॥
দর হইল কুড়ি পচিশ, পলু পুশা লাগছে যে দিস্
এ ক্যামোন হইল্ দ্যাশের ধারা বল বাঁইচবো ক্যামনে।
কিষকেরা ভাইবছে বইস্যা উপায় কিবা করিহে
ধান কলাই হইল্ না ভাই হইল্ না জল-ঝরি[৫] হে॥
আর ক্যামোনে রোপণ করি, জল বিনা মইল্ গরু বকরী
একি হইল বিষম জ্বালা ক্যামনে বাঁইচবে ছেইলে পিলা[৬] হে॥

অনাবৃষ্টি বা খরার ফলে জনজীবনে আসে বিপর্যয়। বৃষ্টি কামনায় তাই গ্রামীন সমাজে পালিত হয় নানা আচার অনুষ্ঠান। উত্তরবঙ্গে জলের কামনায় পালিত বিশেষ অনুষ্ঠান 'হুদুম দ্যাও'-এর পূজানুষ্ঠান। কেবল মেয়েরাই করেন এ আচার, কারণ অমাবস্যার অন্ধকারে লোকালয়ের বাইরের জঙ্গলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে এই আচার পালনের রীতি। এমনকি এ গান পুরুষের শোনা-ও বারণ। বৃষ্টি কামনায় পূজা শেষে লোক-সঙ্গীত :

(৪৫)

দ্যাওয়া তুই বরষেক রে
গাও ধুইয়া মুই বাড়ী নাগি[৭] যাও।

শব্দার্থ : ১—একটাকা সের, ২—নষ্ট, ৩—রেশম কীট, ৪—একজাতের পাট, ৫-জলবৃষ্টি, ৬-ছেলেমেয়ে, ৭-দিকে বা জন্যে।

হারিয়া কোণাত্ ষ্যামোন ছাওয়া ঘুরঘুরায়
ওই মত চেংড়ী গিলা ফ্যারকাটায়[১]
আষাঢ় মাস শাণ মাস[২] ছাওয়াত না হয় পানি
তিনদিনকার শরার গায়ত্[৩] পইরচে ছানি ॥
ছাওয়া তুই বরষেক রে
গাও ধুইয়া মুই বাড়ী নাগি যাও ॥

প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম অবস্থা ঝড় বিশেষতঃ ঘূর্ণী ঝড়। জীবনের হানি, শস্যহানি এবং ঘরবাড়ী ভূমিস্যাৎ হওয়া প্রভৃতি-নানা রকম বিপর্যয় নেমে আসে ঘূর্ণী ঝড়ের তাণ্ডবে। অভাবী সাধারণ লোকের দুর্দশার অন্ত থাকে না। প্রবল ঘূর্ণীঝড়ের ফলে আবার নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে দেখা দেয় বন্যা, ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব কিছু। এই ঝড়ের কথা সংবাদপত্রের সংবাদ হয়, কিন্তু প্রকৃত যারা ভুক্তভোগী তাদের ঘরে ঘরে এই দুর্দশার কথা পৌছে দেয় জনদরদী পল্লী কবিয়ালরাই। তাঁদের ভাবাবেগপূর্ণ কণ্ঠে যে দুর্দশার ছবি ফুটে ওঠে তা ফিল্মে তোলা যে কোন ডক্যুমেণ্টারীর সমমর্যাদা সম্পন্ন। ইতিহাসের বিচারে এই লোকগীতিসমূহ প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে যে ভয়াবহ ঝড় হয়েছিল তারই বর্ণনা পাওয়া যায় তৎকালীন 'বয়াতীর' গানে।

(৪৬)

তেরশ ছাব্বিশ সালে সাতৈ আশ্বিন বৈহালে[৪]
চিরস্মরণীয় তুফান ভুলিবে না কেহ ভুলে।
বাজারে দুর্মূল্য তাঁতী কারও নাই ঘর দরোজা
খাজনা আনা দায় হল অন্নাভাবে মরে প্রজা।
তাদের কথা ষ্যামোন ত্যামোন নিশ্চয়ই ইবার মোদের মরণ
এইবারের এই অভাব পুরণ হবে কি কোন কালে ॥
প্রতিমা নাই মণ্ডপ ঘরে ঘর গিয়াছে বিষম ঝড়ে
কত লোক দেশান্তরে গিয়েছিল বাণিজ্যের তরে।
মহাজনের নৌকা সহ ডুবি গেল অতল জলে ॥

শব্দার্থ—১-চঞ্চল মেয়েদের মত, ২-শ্রাবণ মাস, ৩-জলের অভাবে বাসনে ছানি পড়া, নিগূঢ় অর্থে মেয়েদের তিনদিনের মাসিকের পরও স্নান না করায় অশুচিতা, ৪-বিকালে।

তাদের পিতা মাতার রোদন ধ্বনি সদাই চতুর্দিকে শুনি
আসবে কি আর যাদুমণি অভাগিনী মায়ের কোলে ॥

ঘূর্ণীঝড়ের আরও এক তাণ্ডবের চিত্র পাওয়া যায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ আছড়ে পড়া বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, নোয়াখালি অঞ্চলে। এই ঝড়ের বর্ণনা ও তার ফলে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র পাওয়া যায় লোক-কবির গানে। চিত্র সাংবাদিকের কাজ করেছেন এই লোক-কবিগণ, সারা জগতের সামনে তুলে ধরেছেন ঝড়ের ভয়াবহতা এবং জনগণের দুর্দশার চিত্র।

(৪৭)

১৩৪৮ সালে বরিশালে তুফান ভীষণ
সোনার বাংলাদেশে ওরে সোমবার দিন ঘটনা
১২ই জ্যৈষ্ঠ মাসে রে— ।
সন্ধ্যা হইতে উঠলো তুফান।
ভোলায় কাণ্ডুর ত্মাশে।

পরের দিন দশ ঘটিকায়
নোয়াখালী পটুয়া দিয়া।
বাখেরগঞ্জ ফরিদপুর দিয়া বন্যা হইয়াছে
আর ঘোড়া গরু ভেড়া ছাগল মইর‍্যাছে
জন্তু সকল নরনারী ঘরে ঘরে ॥

এরে গল্প শুনি ধান সুপারী নারিকেল নাই গাছেতে
ঘরের তলে লোক সব পড়ে মাথা গেছে ছিঁড়ে।
বনে নাই পশুপাখী শিয়াল কুকুর মরছে শুনি
তাহা শুনি তাজ্জব হয়ে পড়ে চোক্ষের পানি।

আর শিশু মায়ের কোলে নিদ্রা যায়
কৌতুহলে সব খবর শোনা গেল।
ওরে আচম্বিতে বজ্রাঘাতে সেই নিরঞ্জন দিল
ধান কোঠা পাকা বাড়ী সব বিসর্জন গেল ॥

খরা, বন্যা ও ঝড় তুফান ছাড়াও বাংলায় নামে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। কালোবাজারী আর চোরাকারবারীতে দেশে শুরু হয় অনাচার আর দুর্নীতি, সঙ্গে প্রকৃতির প্রতিশোধ তো আছেই। সব মিলিয়ে জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে কিন্তু তাদের এই দুঃখ দুর্দশার কথা জানানোরও কেউ নেই, স্বভাবতই লোক-কবিরা আসেন এগিয়ে, হাতে তাঁদের দোতারা বা একতারা, কখনও গুবগুবি আর কণ্ঠে তাঁদের শাণিত ক্ষুরধার শব্দের করুণ কাহিনী। অগ্নিবর্ষী গানের বাণীতে জনগণের চোখে ঝরায় আগুন, কিন্তু লোককবির চোখে তখন জল, কানে তার দুর্ভিক্ষের কান্নার রোল—

নেত্রকোণায় কৃষক সমাবেশে আউলিয়া গায়ক রসিউদ্দীন হাজার হাজার শ্রোতার সামনে তুলে ধরেন সেই করুণ কাহিনী—

(৪৮)

আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কারে বা জানাই।
সুখের হপন[১] ভাইগুলোরে মোর চুরাই বাজারে।
বাইরে বাই[২] তেরশো পঞ্চাশের কথা
মনে কি কেউর[৩] পরে গো,
মনে কি কেউর পরে—।
ক্ষুধার জ্বালায় কোলের ছাওয়াল[৪]
মায়ে বিক্রী করে রে, চুরাই বাজারে॥

১৯৪৩ সালে ভারতে দেখা দেয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ফলে হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু সেই সঙ্গে গবাদি পশু ইত্যাদি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অনাহারে প্রাণ হারায়। এই অভাবের সময় আবার জমিদারী শাসন ও শোষণের ফলে সাধারণ মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশার কবলে পড়ে। এই অবস্থার এক করুণ চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে লোকসঙ্গীতে।

শব্দার্থ—১-সুখের স্বপ্ন, ২-ভাইরে ভাই, ৩-কারও, ৪-ছোট ছেলে (কোলের শিশু)।

(৪৯)

প্যাটের খিদায় জ্বইলে মলাম গো
উপায় কি করি।
কি দারুণ আকাল পইরছে[১] রে
ট্যাহার ধান হইল দুই পশারী।
কেউতো কারেও ট্যাহা ছায়না ধার
হাওলাত[২] পাওয়া যায়না আর
মহাজনে কোরেক[৩] দিছে জমিদার বাড়ী
চৌকিদার ট্যাকসো নিল থালা বাটি নীলাম করি॥

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে শেখ করিম বক্স-এর লেখা আরও একটি লোকগীতি তখন পল্লী বাংলার ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল অনবদ্য রূপে—

(৫০)

ক্ষ্যাত[৪] করিয়া মুই ধান পাইলাম না।
হায়রে হায়! এইবার বাচন হইলো দায়॥
ভালমতো হইল ধান ক্ষ্যাতের মাঝারে
দস্তুরমতো হইল ধান চাউল নাই সে ভ'রে।
খরিদ করিয়া জালা[৫] আনলাম রুয়ায় বানলো গোছা
আদ[৬] হাত হিজা দিল টিপ্পা দেহি চোছা[৭]॥
বুরো নিল পান্নী আমন খাইলো পোকে[৮]
ঘরগোষ্ঠী পোলাপুলী[৯] মইলো প্যাটের ভুকে।
কিসের ধান কিসের মান কিসের তম সুখ
পোলাপুলী ভুখে মইলো এই যে বড় দুখ।
দীন শেখ করিম বকসের উপায় হইবে কি
বাজে জিনিস নগদ আনছি চাউলের দাম বাকী॥

শব্দার্থ—১-পড়েছে, ২-ধার, ৩-ক্রোক করা ৪-খেত, ৫ মাটির বড পাত্র, ৬-অর্ধেক. ৭-চিটে (অর্থাৎ ভিতরে চাল নেই) ৮-পোকায়, ৯-ছেলে-মেয়ে।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর নিয়ে আরও একটি গান রচনা করেছেন লোককবি নিবারণ পণ্ডিত। দুর্ভিক্ষের পর গ্রামের যে করুণ চিত্র তা ধরা পড়েছে পল্লী কবির এই গানে। বাংলার এই ভয়াবহ চিত্র লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন বাংলার ঘরে ঘরে, সরকারী নির্দেশে যেখানে অন্যান্য গণমাধ্যম সবকিছু আড়াল করে সংবাদ প্রচার করেছে, তখন লোক-কবির কণ্ঠস্বরকে কেউ রুখতে পারেনি। গ্রামের মানুষের 'মা একটু ফ্যান দাও' করুণ আর্তনাদে শহরের বাতাসও হয়ে উঠেছিল ভারী, গ্রামের এই করুণ চিত্রই লোক-সঙ্গীতে ফুটে উঠেছে।

(৫১)

গ্রামের মানুষ ধ্বংসের বন্যায় ভাসিয়া চলেছে হায়
কে বাঁচাবি তোরা কে বাঁচাবি ওরে আয় ওরে আয়॥
সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলেনা রে আর সোনার পল্লী হল যে আঁধার
নিশ্চিহ্ন হইল কত পরিবার গ্রামবাসী আজ অসহায়॥
পল্লী বধু আজ ভিখারিণী সেজে দ্বারে দ্বারে ঘুরে অন্নবস্ত্র খোঁজে
কেউবা লাগিছে দাসীপনা কাজে কেউবা পথের ধুলায়॥
উঠানে উঠানে শ্মশান কবর মানুষে মানুষে নাইরে খবর
কার বা বাড়ী কার বা ঘর শিবা ডাকে আঙ্গিনায়॥
চলে গেছে আজ বহু গ্রামি কান চলে গেছে কত শিশু ও সন্তান
এখনো যাদের আছে ক্ষীণ প্রাণ কে বাঁচাবি ওরে আয়॥

তেরশো উনপঞ্চাশ ও পঞ্চাশ সালে বাংলার মহা দুর্ভিক্ষের কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা নিঃসন্দেহে রাঢ় বাঙলার ঝুমুরে সেই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ার প্রতিফলন দেখতে বা শুনতে পেয়েছেন। দুর্ভিক্ষের আভাস পেয়ে মহাজনেরাও হাত গুটিয়ে নেয়, সাধারণ মানুষ পেটের জ্বালায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করে নানা অখাদ্যে, ফলে দেখা দেয় মহামারী। এই অবস্থারই চিত্ররূপ তুলে ধরেছেন মানভূমের ঝুমুর গানের 'ভরত' নামের লোকশিল্পী—

(৫২)

রবিশস্য সব হইল তা' পরে বর্ষা কমিল হে
ধান্য মরে জলের বিহনে।

একে ঋণ নাহি পায় লোকে করে হায় হায়
মারামারি হয় জলের কারণে ॥
(প্রাণ বাঁচিবে কেমনে)
দেবতা বৃষ্টি করিল ধান্য সকল বাঁচিল হে
কিন্তু রোগ লেগে গেল ধানে
না দেখি কোন উপায় গাছি পুড়ে নেমে যায়
আনন্দ না আসে কারও মনে ॥
কেহ সাগ সিঝা খায় কেহ কেহ মণ্ড খায় হে
রক্তহীন অন্নের বিহনে।
কদ গুঁদলী জনারি মাড়ুয়া গড়া মুগবিরি
সকল ফুরালো উদর পূরণে ॥
কোন মহাজন কয় কালি আসিবে এ সময়
পরদিন যায় ততক্ষণে হে
তথাপি না দেয় ধান বরং করে অপমান
ধিক ধিক ধনহীন জনে ॥
পেট ভরিলে আনন্দ না ভরিলে নিরানন্দ
ধিক ধিক তাহার জীবনে।
এমন শ্যামা পূজায় সবে নিরানন্দ কায়
উৎসাহ না আসে আর কারও মনে ॥
অল্প ধনে ধনী যারা ভুলে যায় চিন্তামণি হে
কানা হয়ে থাকিতে নয়নে।
সন তেরশো উনপঞ্চাশ সালে এই কথা 'ভরত' বলে
নিজ দুঃখ জানায় গোবিন্দ চরণে ॥

কথায় বলে, 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়'। দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না, মারণের হাত ধরাধরি করে আসে দুঃসময়, অভাবী লোকের তাই আর অভাব ঘোচেনা, বিপদের উপর বিপদ এসে হাজির হয়। উত্তরবঙ্গের তোর্ষা নদীতে ভাঙনের ফলে মানুষের এই দুঃখ কষ্টের ছবি এঁকেছেন নিবারণ পণ্ডিত। সেই সঙ্গে শাসকবর্গের পক্ষপাতিত্ব এবং সরকারী অবহেলার প্রতিবাদে

সরকারকে 'নেহ্য কথা' শোনাতে উদ্বুদ্ধ করেন গ্রামবাসীদের। ১৯৫৭ সালে রচিত এই গানে সুরারোপ করেছেন ভাওয়াইয়া শিল্পী চুঁড়ো গীদাল।

(৫৩)

ও বাহে[1] দেওয়ানির ব্যাটা গ্রুপ (লোন) নেওয়া হইল ভীষণ ল্যাঠা
হলুদ লুটিশ[2] দিয়াছে এখন।
ভাল মন্দ আর কইবেন কারে চাষীর দুঃখ গেল নারে
আবার তোর্ষা নদী ধর্‌য়াছে ভাঙ্গন॥
টাকার গাছ ধলুয়াবাড়ী ঝিনাইডাঙ্গা ঘুঘুমারি
বহু আছে কইব কত নাম।
কুর্সিডাঙ্গা আমবাড়ী ঘরঘরিয়া ডাউয়াগুড়ি
ধরলা নদী ফলিমারি গ্রাম॥
পচ্চিমেতে ওদি ওদি বহুগ্রাম ভাঙ্গিলেন নদী
কান্দেন চাষী সর্বহারা হইয়া।
যাট বিঘা যার জমি আছিল্ স্যাও আজ ফকির হইল্
এখন ভাবেন কপালোত্ হাত দিয়া॥
কোণ্টে[3] বা করিবেন বাড়ী কোণ্টে পাবেন ট্যাহাকড়ি
কায়বা কার করেন খোঁজখপর[4]।
জঙ্গলবাড়ী আর শ্মশানবাড়ী মধ্যত্ এখন ঘর করি
আছেন তারা যেমন বাজিকর॥
কোপালের দোষ নয় ভাইরে কোপালের গুণ কয় তারে
যেমন হইল কুচবিহার শহরে।
নাটাকুড়া হাজরাপাড়া সাহায্য পাইলেন তারা
আছেন তারা দালান কোঠা কইরে॥
পাথরের বাঁধ উঠিল্ শহরবাসী স্থান পাইল্
আছেন তারা ঘরবাড়ী বান্ধেয়া।
প্রায় বিশখান গ্রাম আছে তোর্ষা নদী ভাঙ্গিয়াছে
সরকার আছেন একচক্ষু মুদিয়া॥

শব্দার্থ: ১—বাপুহে, ২—নোটিশ, ৩—কোথায়, ৪-খোঁজ খবর।

সন ১৩৬১ সনে প্রবল বন্যার কারণে
সরকার কিছু ট্যাহা দিয়াছিল্।
শহরবাসী খয়রাতি[১] পাইল্ গ্রামে তাহা লোন হইল্
ঐ ট্যাহারও নুটিশ আসি গেইল্॥
বাঁচি এখন কি খাইয়া তার উপরে লোন লইয়া
সগার[২] মাথা গিয়াছে ঘুরিয়া।
নিদানকালে লোন নিল সরকার এমন হুমকি দিল
আদায় করবেন সার্টিফেট[৩] করিয়া॥
স্বাধীন দ্যাশের স্বাধীন সরকার বিচার তাহার সুবিচার
খানে খানে[৪] হয় বিভিন্ন ধরন॥
কাউকে পিঠে কাউকে কোলে কারও ভীতি[৫] নাচান চক্ষু তুলে
গরীব চাষীর হইল মরণ॥
হাহাকার বৃদ্ধি পাইল জিনিসপত্রের দাম বাড়িল
চাষীর আয় মোটেই বাড়ে নাই॥
কথাগুলান বুঝি লইয়া চল ভাই জুট বান্দিয়া
নেহ্যকথা[৬] সরকারকে জানাই॥

গ্রামের বদ্ধ জলাশয়ে জন্ম নেয় মশা, আর স্বাস্থ্য-বিধির কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই মশা ছড়ায় ম্যালেরিয়া জ্বর। ১৯৪২-৪৩ সালে এই ম্যালেরিয়া গ্রামাঞ্চলে মহামারীর রূপ নেয়, সরকারী প্রচেষ্টায় ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাও তখন ছিল না গ্রামাঞ্চলে। ম্যালেরিয়া একমাত্র ওষুধ কুইনাইন, তখন সেনাবাহিনীর জন্য মজুত করা হত, সাধারণের পক্ষে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। এই ম্যালেরিয়ার ফলে দেশের রুগ্ন স্বাস্থ্যের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন নিবারণ পণ্ডিত।

(৫৪)

কি নিদারুণ আইল রে ভাই ম্যালেরিয়া জ্বর।
ঢুপে ঢুপে[৭] জল খাইতে হয় অঙ্গ কাঁপে থর থর॥

শব্দার্থ : ১-অনুদান, ২-সকলের, ৩-সার্টিফিকেট জারী করে অর্থাৎ হুকুম দখল করা, ৪-এক এক জনের প্রতি এক এক রকম বা এক এক স্থানে এক এক রকম, ৫-কারও দিকে, ৬-যথার্থ কথা বা উচিত কথা, ৭-বারে বারে।

কুইনাইন মিলে নারে আর—
রোগ নাই বলে কুইনাইন বন্ধ কইর‍্যাছে সরকার
চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেরে বলে এ রোগ থাকবে বরাবর ॥

মেলিগ্নেন্ট[1] ম্যালেরিয়াতে—
কত মানুষ মরল ভাইরে পাড়া গাঁয়েতে
পাড়ার লোকে রোগী দেইখ্যারে বলে ভূতে তারে করছে ভর ॥

কয়েক ঘণ্টার ভিতরে—
ভূতে ধরা মেলিগ্নেন্টের রোগী যায় মরে
গরীব লোকে কোথায় পাবেরে কুইনাইন ইনজেকসন আর ডাক্তার ॥

গিয়া কণ্ট্রোল দোকানে—
দায় ঠেকিয়া হলদে বড়ি খাইতেছি কিনে
হলদে বড়ি খাইছে যারা রে কইতে পারে তার খবর ॥

ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রামাঞ্চলে কিভাবে লোকজন মারা গেছে সে সম্পর্কে লোককবি নিবারণ পণ্ডিত আরও একটি গান গেয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। লোক-সাংবাদিকতার এক দুরূহ কাজে ব্রতী থেকে নিবারণ পণ্ডিত জনচেতনা ঘটিয়েছেন। জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন তাদের নিজেদের অবস্থার সম্যক মূল্যায়নে।

(৫৫)

শুনরে ও ভাই শুন তোরা শুন
আসিয়া নিদান মরে হিন্দু মুসলমান দুঃখের বয়ান শুন তোরা শুন।

অ্যাকেতো শ্রমিক মোরা অস্থিচর্মসার
দিনান্তে প্রায় সবার জোটেনা আহার
জ্বলে না প্রদীপ আর ঘর থাকে অন্ধকার, জিনিসের বাজার হইয়াছে আগুন॥

(আবার) এসেছে দারুণ কালরোগ ম্যালেরিয়া
কুইনাইন মিলেনা কোথাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া
চিকিৎসা বিনে কত লোক মরে শত শত
বস্ত্র ছাড়া শেষে হয় গোর কাফুন[2] ॥

শব্দার্থ : ১-ম্যালিগন্যান্ট ২-বস্ত্র ছাড়াই কবর দেওয়া।

মরিছে ছালিমের মা রহিমের বউ
করিমের বাড়ীতে আর বেঁচে নাই কেউ
কত রহিম করিম হায় ময়মনসিং জেলায়
রাস্তায় রাস্তায় হয়েছে রে খুন ॥

সহায় সম্বলহীন লোকের উপরই যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগও নেমে আসে বার বার। দেশে অনাবৃষ্টিতে যেমন ফসল ফলেনা তেমনি সঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বর মহামারী রূপে দেখা দিলে দেশে 'মৃত্যুর মিছিল' শুরু হয়। অনাহারে ও রোগে জীর্ণ হয়ে অকালেই মৃত্যুর কোলে ঝরে পড়ে কত যে প্রাণ। এই করুণ চিত্র প্রকাশ পেয়েছে মালদহের গম্ভীরা গানের মধ্যেও। শিবকে উপলক্ষ্য করে গাওয়া এই গানেও থাকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। এইভাবে গণজাগরণের গানের দ্বারাই সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রকে সচল করে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছেন গ্রামীণ কবিকুল। কালে কালে, আজও রয়েছে এই লোক-সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

(১৬)

শিব তোমার লীলা খেলা কর অবসান।
বুঝি বাঁচে না আর জান্ ॥
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি মাটি করলা নষ্ট হে
দৃষ্টি থাকতে বষ্ট কর‍্যা ছাকছো না কি কষ্ট হে
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর‍্যা শিষ্ট লোকের ইষ্ট মার‍্যা[১]
করলা মোদের গুষ্টি ছাড়া শুন বলি পষ্ট কর‍্যা ॥
তারপরে ম্যালেরিয়ায় হইলাম হালা কান
বুঝি বাঁচে না আর জান ॥
অন্নদা মা ভিক্ষা তোমায় করবে নাকি দান হে ॥
সময়কালে না হয়্যা জল
অসময়ে ফললো কুফল
(ও) সব মুসুরী কলাই গেল ডুব্যা ॥
ক্ষ্যাতের ফসল মইল, আম গ্যাল্ ছালাও গেইল্
ক্যামনে করি গান
বুঝি বাঁচে না আর জান ॥

শব্দার্থ : ১-ক্ষতি সাধন করে।

চ. অর্থনৈতিক দুরবস্থার গান

১৯৩৫-৩৬ সাল। সমস্ত পৃথিবীতে চলছে তোলপাড়। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় চরম আর্থিক সঙ্কট, ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়, চীনের মুক্তি সংগ্রাম আর ভারতবর্ষের নেতৃত্বের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোসকামী মনোভাবে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে শুরু হল আন্দোলন। নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলনে একটি 'জারীগান' পরিবেশন করেন লোককবি অখিল চক্রবর্তী। গণ-আন্দোলনের পটভূমিকায় গীত লোক-সঙ্গীতটিতে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

(৫৭)

কপালের দুঃখ ঘুচবে কতদিনেরে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণেরে।
হায় হায় রে—।
বুঝলাম না বুঝলাম না ভাইরে ঘরে রইলাম বইয়া
চৈতন্য হইল শ্যাষে সঙ্কটে পড়িয়া।
অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া রোগে অনাহারে
মইরছে কত মা বোন শিশু হাজারে হাজারে ॥
হায়, হায় রে—।
সঙ্কটে পড়িয়া তখন হিন্দু মুসলিম যত
গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু হইলাম মিলিত।
খাদ্য দ্যাও বলিয়া দ্যাশে হইল আন্দোলন
দরখাস্ত পড়িল কত গবর্ণমেণ্ট সদন।
সস্তাদরে গরীবরে জিনিসপত্র দ্যাও
অন্নবস্ত্র কুইনাইন দিয়া গরীবরে বাঁচাও ॥

অবশ্য এই আন্দোলনের ফলে সরকার যা ব্যবস্থা করলো তা কেবল স্বজন-পোষণ আর দুর্নীতিরই নামান্তর। এই অবস্থার কথাও তুলে ধরা হয়েছে লোকসঙ্গীতে।

(৫৮)

হায়, হায় রে— ।
তার পরে চাপে পড়ে বুদ্ধিমান সরকার
মিটাইতেছি দাবী কিঞ্চিৎ করিল স্বীকার ।
ঘুষখোর আর চোরদের সামনে রাখিয়া
ছালার মুখ বান্দিয়া ঢালে উব্‌দুত[১] করিয়া ।
দেড় ছটাক কণ্টোলের দোকান গরীব বাঁচিবার
সাহীদার হইল যত প্রিসিডেন্[২] মেম্বার রে ॥

হায় হায় রে— ।
মুখ চিনিয়া বিলি হইল কণ্টোলের কুইনাইন
টেক্স নাই যার কার্ড পাইবানা সাহীদারের আইন ।
রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উসার[৩]
কেউ পায়না ছিড়া ত্যানা[৪] কেউ করে বাহার ॥

তাই বলি ভাই চল সবাই হয়ে হুঁশিয়ার
সবে মিলে বন্দ করি চোরাই কারবার ।
কণ্টোল দোকান আনি আমাদের হাতে
সবাই আইস্যা যোগদান করুক মোদের সাথে ।
কি কি জিনিস নাই আমাদের কি কি জিনিস চাই
পূরণ করিতে দাবী মোরা আন্দোলন চালাই রে ॥

আর্থিক দুরবস্থায় দেশের কৃষক সম্প্রদায়ই সবসময়ে পড়েছে চরম দুর্দশায়। দেশের আর সকলের অন্নের যোগান দিয়ে তারাই রয়েছে উপবাসী, তাদের পরণে বস্ত্র নেই, পেটে নেই অন্ন। রুগ্ন অসহায় এই কৃষক সম্প্রদায়ের চরম দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের গানে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে বড় আক্ষেপ করে তাই নিবারণ পণ্ডিত গেয়েছেন—

(৫৯)

হে কবি— ।
তোমার সোনার মাঠে—
কে কাটিবে ধান, কে গাহিবে গান ।

শব্দার্থ : ১-উপুড় করে, ২-প্রেসিডেন্ট, ৩-বালিশের ওয়ার বা ঢাকনা, ৪-ছেঁড়া ন্যাকড়া ।

কেউ রুগ্ন শুয়ে আছে কেউ ছেড়ে গেছে গ্রাম
কেউ ত্যাজিয়াছে প্রাণ— ।
তোমার মাঠের রাজা মরেছে কিষাণ।

গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক চিত্র পরিষ্কার পরিস্ফুট হয় লোক-কবিদের গাওয়া নানা গানে। গ্রামীণ চিত্রের এ এক মৌখিক প্রতিবেদন। যেন কোন ফিল্মে তোলা তথ্যচিত্র। গণজাগরণ ও সমাজচিত্র বর্ণনায় এই লোক-সাংবাদিকতা অনন্য। এমনি একটি গান আব্বাসউদ্দীন আহমেদ গেয়েছেন ভাওয়াইয়া সুরে, রাজবংশী ভাষায়।

(৬০)

এলা দিনের বা গতিক ভালা নোয়ায়রে ও মুই ক্যামনে বাঁচিয়া রঁও।
ঘরে মোর ভাত নাই পেন্দনে কাপড় নাই ওহো রে।
এলা মুই শরমে বাচোং না রে—ওকি দিনো দিলেক বিদি ওহো রে॥
বৌয়ের হাতের পৈছা খাড়ু[১] ও মুই ব্যাচেয়া খাইচোং রে
এলা ক্যামন করিয়া বাঁচিয়া রমোঁ ওহো রে।
বৈশাখে বিতরী হেমতি ভাদরে[২] ওরে মাঝিয়াত্ সরিষা কান্দে
ওরে আদখানা[৩] ভাগ তার জমিদারের ওহো রে॥
আর আদখানাতে মোর চলে না রে
আই মুই ক্যামনে বাঁচিয়া রঁও।
প্যাটের ভোকত মোর প্যাটোত কান্দে রে
ও মুই গগনে পাতোং রে হিয়া॥
বিদি ত্যাহার ভিতি[৪] চায়া দেখোং
মোর বাতি বুজি যায় নিব্যা রে[৫]॥

দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থায় চারদিকেই দেখা যায় অভাব আর অনটন। গরীবের দুবেলা অন্ন জোটে না, যুব সম্প্রদায়ের সামনে রুজি রোজগারের নেই কোন ব্যবস্থা, ফলে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে ঘরে ঘরে। কোনওক্রমে দিন গুজরান ছাড়া অভাবী লোকের কোন উপায় থাকে না। এমনই এক সামাজিক

শব্দার্থ—১-কোমর ও পায়ের অলঙ্কার, বিছেহার ও মল, ২-ভাদ্র মাসে হৈমন্তী ধান, ৩-আধখানা, ৪-দেহের দিকে, ৫-জীবনের আলো নিভে আসে অর্থাৎ মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

চিত্র ধরা পড়ে লোক-সঙ্গীতে। উত্তরবঙ্গের চটকা সুরে গানটি গেয়েছেন লোককবি নিবারণ পণ্ডিত।

(৬১)

হামরাগিলা হালুয়া[১] কিষাণ কামাই করি খাং
কাম নাই কাজ নাই কোণ্টে এলায় যাং।
দিন হাজিরা আড়াই ট্যাহা যদি বা কাম পাই
দিনমানে সেই শুকান রুটি ভাতের উদ্দিশ[২] নাই॥
ভাতের হাউস[৩] ছাড়ছুং, এলায় রুটির পাইসা না জুটে
টারি টারি[৪] ঘুরছোং ফেরছোং কামাই না পাং কোণ্টে।
হামরাগুলার মতন যঁায়[৫] তায়[৬] সেনা দুখ বুজে
হামার চেংড়াগুলার ঢং দ্যাকিয়া মরিয়া যাং লাজে॥
ঝাকুয়া চুল চেংড়াগুলা হামার টারিত[৭] রাখে
ঘোরাং ফেরাং করে দিনভর ছা দোকানত[৮] থাকে।
দুক্কুর আইতোত্[৯] খাইতে আইস্যা রাগে গজগজ করে
মুখের আগত না কও কাথা দাদারে কখন ধইর‍্যা মারে॥
চাকরি বাকরি কামাই রুজি পাইবার আশায়
জিও জিও করি চেংড়ার দল মিটিং বাড়ীত্ যায়।
মিছা ঐ দৌড়াদুড়ি সকাল আর বৈকাল
সার হইছে ছিরগেট[১০] টানা দাদারে চক্ষু দুইডা লাল॥

দেশের আর্থিক দুরবস্থা থাকায় কৃষকের দুর্গতির যেন আর শেষ নেই। সারা বছরের পরিশ্রমের ফলে তাদের দৈনিক একবেলা দু মুঠো অন্ন সংস্থানও হয় না। এই নির্মম সত্যের চিত্র লোক-সাংবাদিকতার গানেই পাওয়া যায়।

(৬২)

আমরা ধান কাটিরে—।
সগায়[১১] মিলি খাটিখুটি কি পাইলোং রে ধান।
(হায়রে) প্যাটের ভোকত[১২] দিন কাটে শুন্যা দোত্‌রার গান॥

শব্দার্থ—১-চাষী, ২-দেখা, ৩-ইচ্ছা, ৪-বাড়ী বাড়ী (এখানে সেখানে) ৫-যে, ৬-সে, ৭-আমাদের মত, ৮-চায়ের দোকানে, ৯-মাঝরাতে, ১০-সিগারেট, ১১-সকলে, ১২-(

চাষীর দুক্ষ[1] হায় কাঁয় বুইজবার পারে
আশ্বিন কাত্তিক মাসোত চাষীর যে দুগ্‌গতি
সারা বছর খাটি খুটি কাঁয় পুরাইবে ক্ষেতি।
মোরা ধান কাটিরে॥

গ্রামের অভাবী লোকের যে করুণ অবস্থা তার সম্যক চিত্র পাওয়া যায় লোককবিদের গানে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন গ্রামের অভাবী মানুষেরা অভাবের তাড়নায় মা বিক্রী করতে বাধ্য হন তাঁর সন্তানকে। এই ভয়াবহ চিত্র লোক-কবি তাঁদের গানে তুলে ধরেছেন বারে বারে।

(৬৩)

ও ভাই মোর গাঁওয়ালী রে[2]—।
কতয় দুক্ষে তোমার দিন কাটে।
ভাত কাপড় তাও না জুটেরে—
ভাই মোর অভাবের সময় কাঁও না খপর করে রে।
নাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায় আরো বেচায় ফাল
খাজনার তাপেতে বেচায় দুদের[3] ছাওয়াল[4]॥
ভাই মোর গাঁওয়ালী রে॥

দেশের আর্থিক দুরবস্থায় সাধারণ কৃষকের যেমন দুর্দশা, তেমনি দুর্দশা হয় অন্য অভাবী লোকদেরও। সামান্য আড়াই সের গমের বিনিময়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কোনওক্রমে দিনাতিপাত করতেন এইসব অভাবী জনগণ। মুর্শিদাবাদ জেলার 'ভারবোল' উৎসবে সাধারণের এই অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন লোক-কবিগণ।

(৬৪)

ধন্য বাহার গরীব প্রজার বিধি হল বাম
(দেখে) করতে রাস্তা বস্তা বস্তা সস্তা করেন গম॥

শব্দার্থ—১-দুঃখ, ২-গ্রামবাসী, ৩-দুগ্ধপোষ্য, ৪-ছেলে।

গো-ভাইনে[১] যখন এনে ভর্তি করেন গম
লোকে ভাবে এল ভবে দুঃখের ওষুধ অনুপম ॥
(ওগো) কলে দিয়ে গম পিষিয়ে বের করে আটা
পেটে খেয়ে রুটি ছুটা-ছুটি রিলিফের মাটি কাটা
যত মজুর মুটে দিন খেটে পাই আড়াই সের গম
কেহ করে বুদ্ধির জোরে বোঝাই নিজ গুদাম ॥
যাক যে যা পারে সেই তা করে এ ভব সংসারে
কবে সুখের স্বপন ভেঙ্গেরে মন যেতে থাকে ঘরে।
সুখ বিলাসে ভবে এসে কাটিও না দিন
কেও মনের ভুলে থেকোনা ভবে কয়দিনের অধীন ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনে ১৯৩৯-১৯৪৫ সালে সারা ভারত তখন জলছে অন্য দেশের মত, অনাহার, দুর্নীতি ও অপশাসনের বেড়াজালে, দেশে সব কিছুরই তখন অভাব অর্থাৎ খোলা বাজারে পাওয়া যায় না তবে কালো বাজারে সবকিছুই বেশী দামে পাওয়া যায়। এই দুঃসহ অনাচারের কথা গ্রামীণ গীতি-কাব্যেও ধরা পড়ে। লোক-কবিরা দেশের এই সামগ্রিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁদের গাওয়া গানে।

যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে যে দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, মানভুম জেলার লোককবিদের কণ্ঠে তারই আভাস ভরত মাহাতোর ঝুমুর গানে—

(৬৫)

সঘনে ছাড়ে নিঃশ্বাস ঘটিল কি সর্বনাশ
উপায় হারা হইল মমিন।
কেমনে কাটিবে এবার দিন হে
মনে মনে ভাবিছে মমিন ॥
যদি বলে দিব সুতা দাম শুনে ধরে মাথা
হিসাব করিলে মূলে হীন।
টুপি, লুঙ্গি জুতা ছাতা সে সকল গেল কোথা
সুতার কঁটা[২] বন্ধ করিল সরকার
ভরত বলে সে পাওয়া কি থাকে চিরকাল হে ॥

শব্দার্থ : ১-গোডাউনে অর্থাৎ মাল জমা রাখার জায়গায়, ২-কোটা (বরাদ্দ পরিমাণ)।

শুধু কি সরকারী অব্যবস্থা, সুদখোর মহাজনের অত্যাচারে দেশের অভাবী মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই। চালের জন্য তারা মহাজন ও আড়তদারদের বাড়ী বাড়ী ঘোরে সারাদিন কিন্তু কোথাও চালের ব্যবস্থা করতে পারে না, ফলে অনাহার বা অর্ধাহার। দেশের এই করুণ চিত্র পাওয়া যায় লোকসঙ্গীতের শিল্পীদের কাছে তাঁরা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গিয়ে দেশের এই অবস্থার কথা জানিয়েছেন সকলকে, যাতে গণচেতনা বৃদ্ধি পায়, যাতে সকলে সচেতন হতে পারেন। লোক শিল্পীদের এই অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

(৬৬)

এ বছর ভাদ্র আশ্বিনে ঋণ না দেয় মহাজনে
হেন আকাল না দেখি নয়নে।
জীবন না যায়রে ধরা টাকায় চাউল পাঁচ সেরা
ঘুরে মরি চাউলের কারণে॥
দিনে যদি চাউল পাই উপাস থাকি সন্ধ্যায়
ভুখে নিদ্রা না আসে নয়নে।
কেমনে বাঁচিবে পরাণ টাকায় তিন সের ধান
তনু ক্ষীণ অন্নের বিহনে॥
কিন্তু যারা ধনবান বিষম তাদের মন গুমান[১]
দিবসে তারা দেখে নয়নে।
দেড়ি সুদে[২] টাকা দিব সুদে মূলে[৩] ধান লিব
যে দরে বিকাবে অগ্রাণে[৪]॥
মহাজনের বাসায় যদিবা খাতক যায়
বসিতে না বলে কোনজনে
তথাপি খাতকগণ হয়ে দুঃখিত মন
বসে থাকে মলিন বদনে॥
কি কারণে মোর ঘরে আসিতেছে বার বারে
ডাকাতি করিবে লয় মনে॥
সারাদিন কেটে যায় সবে নিরানন্দ কায়
ঘরে আসে বেলা অবসানে॥

শব্দার্থ: ১-মনে গর্ব, ২-দেড়গুণ হারে, ৩-সুদ ও আসলে, ৪-অগ্রহায়ণ মাসে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থায় সামান্য কয়েকজন কালোবাজারী ও মজুতদার ছাড়া অভাবে জেরবার প্রায় সকলেই। তার মধ্যে আর্থিক শোষণ তো চিরন্তন। আসামের চা বাগিচায় সাঁওতাল, কোরা, মাহাতো প্রমুখ শ্রেণীর লোকদের সস্তার শ্রমিক হিসাবে নেওয়া হত। তাদের এই সামান্য মজুরীতেও ভাগ বসাত চা-বাগানের কুলির সর্দার। এই চা-বাগানের কুলিদের দুঃখময় জীবনের কথাও ঐ অঞ্চলের ঝুমুর গানে ফুটে ওঠে। দুঃখময় জীবনযাত্রা ও শোষণের তীব্র জ্বালা এই গানের কলিতে কলিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(৬৭)

চল মিনি আসাম যাব খাশে বড় দুখরে
আসাম খাশেরে মিনি চা বাগান হরিয়ার[১]রে ॥
ফাঁকি দিয়া আনিলি আসাম
রে নিঠুর শ্যাম, ফাঁকি দিয়া আনিলি আসাম।
চাউল ভাজা চায়ের পানি বাঁচাইল পরাণ ॥
সাহেব বলে কাম কাম[২]
বাবু বলে ধইরে আন
সদ্দার[৩] বলে লিব পিঠের চাম[৪]।
রে নিঠুর শ্যাম, ফাঁকি দিয়া আনিলি আসাম ॥

দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থায় সাধারণভাবে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, এরই মাঝে সুযোগ বুঝে মুনাফার পরিমাণ বাড়ায় কালোবাজারী ও মজুতদার। সার্বিক যে আর্থিক সঙ্কট দেশের বুকে নেমে এসেছিল তারই এক চিত্র ফুটে ওঠে লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের গানে। উত্তরবঙ্গের চটকা সুরে গাওয়া এই লোকগীতিতে সমাজের আর্থিক অবস্থার কথা-চিত্র প্রকাশ পায়।

(৬৮)

শুনেন রে ভাই সমাচার
ভাব ধরিল্ কি চমৎকার।
মিঠা তৈল[৫] হইল্ আঠারো ট্যাহা স্যার[৬] ॥

শব্দার্থ : ১—সবুজ, ২—এসো এসো, ৩—সর্দার, ৪—চামড়া, ৫—সরষের তেল, ৬-এক সের।

ডাইলের পোয়া একুশ আনা
পাথর থাকে চাবান যায়না
দাম বাড়িল্ ভাই শুকান্ মরিচের[১] ॥
বউএর মাথার নারিকেল তৈল্
সিটারও[২] দাম বাড়ি গেইল্
মাছের দাম হইল য্যান সোনাদানা ॥
বাদ দিনু সাবান চুড়ি
সাধারণ ধুতি শাড়ী
আর বুঝিরে পিন্দোন যাবে না ॥
হাহাকার হইল্ শুরু
বেচির দিচে[৩] হালের গরু
বন্দক রাখে কেউ বউএর কানের সনা[৪]
অনাহারে অর্ধাহারে কেউ চইলছে ধার কইরে
শাখাই বাড়ী কেউ কইরচে আনা-গণা ॥
ইবার বিষ্টি হইল্ ভারী, হয় নাই তরি তরকারী
হাটোত্ যাইয়া কি জিনিস বেচাই।
লাউ কুমড়া ইটা[৫] ওটা এসবে আর পাইসা কয়টা
বেচির জিনিস ঘরোত্ কিছুই নাই ॥
কিনিতে চাই সস্তা দরে, জিনিসের দাম রোজই বাড়ে
দিল্লী বলে নাইম্‌ছে বাজার।
তুমি আমি বুজি সিটা সংসার চালান কি যে ল্যাঠা
মরণ হইলেক ভাই তোমার আর আমার ॥

'টুসু' গানের মত বাঁকুড়া ও বীরভূমের 'ভাদু' গানেও ভাদুকে নিয়ে ঘরকন্নার গান ছাড়াও মাঝে মাঝে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার কথাও ফুটে ওঠে। ভাদুকে নিয়ে রচিত নানা কল্প-কাহিনী ছাড়াও দারিদ্র্যের চরম অবস্থার কথা ভাদু গানের অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সেখানের পল্লীবালারা রাজনীতির খবরাখবর না রেখেও তাঁদের জীবনের দুঃখকষ্টের কথা গানের মধ্যে ফুটিয়ে

শব্দার্থ: ১-শুকনো লঙ্কা, ২-তারও, ৩-বেচে দিয়েছে, ৪-কানে পরার সোনার গয়না, ৫-এটা।

তোলেন। সারা ভাদ্র মাস ধরে চলে ভাদু উৎসবের গান, কিন্তু তার মধ্যেই জীবনের গানও ঢুকে পড়ে কোন ফাঁকে। এমনি একটি গানে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা ফুটে উঠেছে :

(৬৯)

ও সোহাগী ননদিনী, লীলাম্বরী[১] পরবি ?
খঁপায়[২] সাদের[৩] গেঁদা ফুলের পেরজাপতি[৪] ধরবি ?
হায় হায় হায়রে, পরনে নাই তেনা[৫]
ভাসুর ঠাকুর আঙ্গনেতে ছিঁড়া[৬] কঁ্যাথাডা[৭] দেনা ॥
শরম ধরম রইবে কুথায় বিবির হাট্যে যাব
কনডোলেতে[৮] নাইন[৯] দিয়ে চাল মাগিয়ে খাব।
কনডোলেতে চাল নাইরে কোপালে মার ঝেঁটা
পথের পাশে মানুষ মরে কুকুর বিড়াল পাঁঠা ॥

ছ. অনাচার ও দুর্নীতি সংক্রান্ত গান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বৃটিশরাজ যখন বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তখন দেশে শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। শাসক-সম্প্রদায়ের দুর্বলতার সুযোগে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কালোবাজারী ও মজুতদারী আর সেই সঙ্গে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের বিভিন্ন আমলা তাদের স্বজন-পোষণ আর দুর্নীতির পুরো সুযোগ কাজে লাগায় স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির আশায়। সরকারী স্তরে এই শোষণ ও দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে, সাধারণের জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এই অবস্থার সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন গ্রাম্য কবিকুল। মূলতঃ শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষ বেশি পরিমাণে শোষিত হয়েছিল, কারণ তাদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে বিভিন্নজন নানাভাবে ঠকিয়েছে এইসব অভাবী মানুষদের। জনগণের মুখপাত্র বলতে তখন একমাত্র জনগণ-শিল্পী লোককবি। তাদের গানের মধ্যে তাই

শব্দার্থ : ১-নীলাম্বরী শাড়ী, ২-খোঁপায়, ৩-সাধের, ৪-প্রজাপতি, ৫-ছেঁড়া ন্যাকড়া, ৬-ছেঁড়া, ৭-কাঁথাটা (কাপড় না থাকায় ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে লজ্জা নিবারণ), ৮-কণ্ট্রোলে, ৯ লাইন।

এই সমাজ-চিত্রের স্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে। মুর্শিদাবাদ জেলায় 'ভারবোল' বলে এক ধরনের লোকসঙ্গীতে গ্রামের মানুষ ছাড়া শহরের মানুষেরাও স্বজন-পোষণের তাড়নায়, কিভাবে বঞ্চিত হয় তারই চিত্র ফুটে উঠেছে।

(৭০)

দাদা গরীব ভাইয়ের দুঃখ দেখে বাঁচে না পরাণ
ইয়ার চেয়েও দুঃখু পায় শিক্ষিত জন গো॥
চাকরী কইরবে বলে ছেলে, পিতা তাদের দেয় ইস্কুলে
ছেলে চাকরী কইরবে বলে
তারা ডিগ্রী ধরে নিল গো॥
সরকার একটা চাকরী দিল, মনে ভাবে ভাইগ্য ভাল
উপরে ব্যাকিং যাদের ছিল, তারা চাকরী কাইড়্যা নিল গো॥

'টংক' প্রথার অর্থ হল, টাকার বদলে ধান দিয়ে খাজনা পরিশোধ করা। ধানের ওজনের হিসাব ছিল ৮০ তোলায় এক সের, কিন্তু জমিদারী জুলুমে তা ৯০ তোলায় একসের হিসাব করা হত। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৬ সালে জমিদারের হুকুম জারী হয় যে ১০০ তোলায় একসের হিসাবে ধান দিয়ে খাজনা পরিশোধ করতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকগণ তাদের নেতা মনি সিং-এর নেতৃত্বে এক আন্দোলন সংগঠিত করে এবং এই আন্দোলনের কথা ও তার প্রেক্ষিত সঙ্গীতের মধ্যে ফুটিয়ে লোককবি নিবারণ পণ্ডিত এই অব্যবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(৭১)

শুনেন যত দেশবাসী শুনেন ভাই গরীব চাষী, শুনেন সর্বজন।
কৃষক দরদী মনি সিং-এর বিবরণ।
সংক্ষেপেতে দুই এক কথা হে করিব বর্ণন॥
একদিন মনি আচম্বিতে দেখে সুসুং রাজবাড়ীতে হাজং বহুলোক
জঙ্গী চেহারা তাদের ভয়ে ভীত মুখ
কারণ জানিতে মনি হে হইল উৎসুক॥
ডাকি এক হাজং-এরে নিয়া মনি কিছুদূরে জিজ্ঞাসে কারণ
কি কারণে তোমাদের ভয়ে ভীতু মন
বিস্তারিয়া কহ শুনি হে সব বিবরণ॥

হাজংটি কাঁদিয়া বলে শুন বাবু তাহা হলে (আমরা) দোষী সর্বজন
ধান আনিয়াছিলাম নব্বুই-এর ওজন
একশো তোলায় সের দিতে কয় হে পেয়দাগণ[১]।
নব্বুই তোলাতে সের, ধান দেই টংকের জানি সর্বদায়।
এখন সের দিতে কয় একশো তোলায়
এই দোষে হইয়াছি দোষী হে ছাড়ে না পেয়দায়॥

আসিয়াছি কোন সকালে ক্ষুধায় এখন পেট জলে পাইনা বিদায়।
বিকালে আসিবেন বাবু বাহির আঙ্গিনায়
পেয়দারা জানাইয়া গেল হে কর্কশ ভাষায়॥

হাজং-এর কথা শুনি হবাক হইয়া বলে মনি হবে প্রতিকার
রক্ষা করবো তোমাদের প্রতিজ্ঞা আমার
বন্ধ করবো জুলুমবাজী হে অন্যায় অবিচার॥

মনি আপন জমি বাড়ী সমিতিতে দান করি করেন আবেদন
কে কে হবে কৃষক-কর্মী বলো এইক্ষণ
সংগ্রাম চালাইতে হবে হে জীবন মরণ॥

তারপরে এক সভা হলো নিয়া হাজং কোচ ডালো যতেক কিষাণ
গাড়ো বানাই ছেলে মেয়ে হিন্দু মুসলমান
সবাইরে চিনাইলো মনি হে রক্ত নিশান॥

ললিত হান্নানের মত কর্মী এলো শতশত ফৌজি দশ হাজার
মেয়েরা আসিল সেজে কয়েক হাজার
টংক প্রথাটি শেষে হে হইল চুরমার॥

যুদ্ধের বাজারে দেশে কালোবাজারী ও কন্ট্রোলে দুর্নীতির ফলে জনগণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। ঘুষখোর আর মজুতদারেরা দুহাতে পয়সা লোটে, ফলে আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। দেশের এই অনাচার ও দুর্নীতির কথা লোকসঙ্গীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চারণের দায়িত্ব নিয়ে লোক-সাংবাদিকতায় নেমেছিলেন তৎকালীন লোকশিল্পীগণ। তাঁদেরই অসংখ্য গান ছড়িয়ে আছে মাঠে ঘাটে—

শব্দার্থ : ১-পেয়াদা।

(৭২)

ভাব কি চমৎকার গো দেশের ভাব কি চমৎকার
চোরেরা খায় মণ্ডা মিঠাই সাধু করে হাহাকার।
কত মানুষ গৃহহারা ভাত পায়না দিনান্তে তারা
না পাইয়া কূল কিনারা ঘুরে দ্বারে দ্বার।
কত বাবু এই সুযোগে লুটতেছে বাহার
ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ে করে পাকা বাড়ী ক্ষেত-খামার॥

বস্ত্রহারা উলঙ্গিনী ঘুরে ফিরে মা ভগিনী
সদায় ঝরিছে পানি দুনয়নে তার।
বসন ভূষণ নাই কি নারীর লজ্জা ঢাকিবার
এই বুঝি রে সেই বাঙালীর চরম খেলা সভ্যতার॥

হিন্দুর বিধবা নারী পরুক কন্ট্রোলের শাড়ী
কর্যাছে হুকুমজারী এই দেশী সরকার।
দাহুন কাফুন কাপড় ছাড়া কোন স্থাশে হয় কার
বাইচ্যা থাইক্যাও সুখ হইল না, মরণেও হবে কেলেঙ্কার॥
সুখ হবেনা মর্যা গিয়া হবে না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
লুকাইছে কাপড় নিয়া যত মজুতদার।
মড়ার কাপড় চাইলে তারা মূক, মুখখান ভার
মুখের জবাব পাইগো তাদের ঘুরতে ঘুরতে দু'চার বার॥
দেশের যত ধনী মানী তারা খাইল লবন চিনি
এই কথাটা সবাই জানি বলতে হয়না আর।
তবু কেন দেশের মানুষ হইলনা হুঁশিয়ার
এই দ্যাশটারে লুইট্যা খাইল ঘুষখোর আর মজুতদার॥

অনাচার আর দুর্নীতির আর এক দিক কৃত্রিম বস্ত্র সঙ্কট-সৃষ্টি। ১৯৪২-৪৩ সালে এই বস্ত্র সঙ্কট চরমে ওঠে, সেই সময় দেশের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করেন কবি নিবারণ পণ্ডিত তাঁর লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে।

(৭৩)

বঙ্গনারী হইল বিবসনা— ।

(তারা) দিবসেতে ঘর হইতে বের হইতে আর পারে না।

কলসী কাঁখে অপরাহ্ণে, যায়না রে জলের জন্যে

জলের ঘাটে গ্রাম্য ললনা

তারা আঁধার হইলে যায়রে জলে দিনের আলোয় আর আসে না ॥

গ্রামের দুস্থ পুরুষ নারী, যারা ভিক্ষা করে বাড়ী বাড়ী

ভিক্ষা ছাড়া তাদের দিন চলে না

তারা লোক সমাজে মুখ দেখাতে লেংটা[১] হইয়া আর পারে না ॥

ছিঁড়ে গেছে ক্ষীণ বসন, মিলেনা আর বস্ত্র নূতন

বাজার হইল আজব কারখানা

কাপড় দিয়া সৌতো এখন দাহন করা আর চলে না ॥

লবণ কেরোসিন চিনি, আধসের (আর) দেড় ছটাক কিনি

রেশনকার্ডে কাপড় পাওয়া যায়না—

এমনি করে আর বা কত থাকবে দেশ বসন বিনা ॥

লোক-সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালনে রত লোকশিল্পীগণ দেশের অনাচার আর দুর্নীতির মুখোশ খুলে দেওয়ায় এইসব লোক-শিল্পীদেরও সহ্য করতে হয়েছে অজস্র দুঃখ কষ্ট ও প্রশাসনিক অত্যাচার, তবুও অত্যাচারের ভয়ে লোক-কবিগণ নীরব হননি কখনই, যেখানেই অনাচার আর দুর্নীতি সেখানেই লোক-কবিদের স্বচ্ছ দৃষ্টি স্পষ্ট করে তুলেছে এইসব অনাচার আর দুর্নীতির চিত্র। লোক-শিল্পী 'মটোর বাবু' মালদহের 'গম্ভীরা' গানে শিবকে সামনে রেখে তুলে ধরেছেন তৎকালীন কালোবাজারী ও দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকদের চিত্র।

(৭৪)

আজ ভাল মান্‌ষির দিন গিয়াছে ওহে পশুপতি

তিন চোকে কি ত্থাকতে পাওনা মোদের কি দুর্গতি ॥

শব্দার্থ : ১-উলঙ্গ, কাপড়ের অভাব এতই প্রকট।

জাল জালিয়াতী বিশ্ব জুড়্যা
বেলাক-মার্কেটে[1] বাজার ভর্যা
গাড়ী চালায়, বাড়ী হাঁকায়, জ্বালায় বিজলী বাতি ॥
বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম সেবা
রসাতলে গেল ডুব্যা
হিংসা বিবাদ দলাদলি, হায়রে কি দুর্মতি ॥
ন্যাংটা হয়্যা প্যাংটো মুখে[2]
মরলো যে সব গরীব লোকে
তাইতো মোরা ন্যাংটো ভোলার কাছে জানাই নতি ॥

যুদ্ধের বাজারে নব্য অর্থলোভীদের দল ঘুরে বেড়াতো আনাচে কানাচে। যত রকমের জাল জুয়াচুরির এরাই ছিল মদতদাতা। কিন্তু সমাজের কাছে এরা নিজেদের এমনভাবে প্রকাশ করতো যাতে তাদের সভ্যসমাজের ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বলে লোকে বিশ্বাস করে কিন্তু লোক-কবিদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়, এইসব মেকী বাবুদের স্বরূপ ধরা পড়ে লোক-কবিদের গানের মধ্যেই।

(৭৫)

বাবুদের নব্য বাবুয়ানা গো—।
বাবুদের নব্য বাবুয়ানা।
ঘণ্টায় ঘণ্টায় গরম জল আর উইলস্ মার্কা চুরুট টানা ॥
পাইয়া কন্ট্রোলের বাজার, কত হবু[3] হইল অফিসার
কত গবু[4]র হইল পাওয়ার দেখি ভাব নমুনা
চাল চলন দেখিলে বাবুর চিনতে কষ্ট হয়না।
হাতে ঘড়ি চশমা পরা তিরিশ ট্যাহা মাইনা ॥
নব্য সভ্য বাবুদেরে দেখতে পাবেন চা'য়ের ঘরে
ইংরেজীতে আলাপ ক'রে বাংলা আর বলে না।

শব্দার্থ: ১-ব্লাক মার্কেট বা কালোবাজার, ২-পাংশু মুখে বা মুখ শুকনো করে, ৩-হবু রাজা ও ৪-গবু মন্ত্রীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

দু এক কৌটা চুরুট ছাড়া তাদের দিন চলে না।
দৈনিক বিশ কাপ চা না হলে সেই বাবুদের মেজাজ হয় না॥
হইলে মাস কাবার হিসাব দেখায় চা-দোকানদার
বাবু বলেন কত তোমার হয়েছে পাওনা।
গত মাসের চিনির বস্তার দাম দিতে হবে না
দেনা পাওনা নাই আর কারও, চুরুট খাওয়াও আর একখানা॥

দরিদ্র লোকদের চিকিৎসার জন্য তৈরী হয় দাতব্য চিকিৎসালয়, কিন্তু সরকারী অনুদানে পাওয়া ওষুধের প্রায় কিছুই পাওয়া যায়না এইসব হাসপাতালে। এই নিয়ে মাঝে মধ্যে সংবাদপত্রে কিছু লেখা হলেও সামগ্রিক-ভাবে জনচেতনা বৃদ্ধি করে সমবেত আন্দোলনের পথিকৃৎ হয়নি কেউই, কেবল লোক-কবিরাই এই গণচেতনার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বার বার। ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে রাজনীতি সচেতন নেতৃবৃন্দ মশগুল ছিলেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের আশায়, ফলে দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে গ্রামে-গঞ্জে। এমনি অবস্থায় তৎকালীন বঙ্গদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমায় মাদারিপুর সরকারী হাসপাতালের চরম দুর্নীতির কথা নিয়ে গান বাঁধলেন লোক-কবি আর প্রচার করতে লাগলেন এই অবস্থার কথা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে।

(৩৬)

শুকায় পদ্মা মধুমতী জলশূন্য ওই কুমারী নদী
গাড়ি ঘোড়া কত চইল্যা যায়।
ঔষধ নাই রুগীর ঘরে বহু লোক হসপিটালে রয়॥
হাসপাতালের কর্মচারী তারা দেয় মাথায় বারি
ক্ষুধা পাইলে পথ্য নাহি দেয়।
হাসপাতালের ডাক্তার যারা ঔষধের মাত্রা কমায় তারা
শ্বাসে ক্যাবল রুগীরে ভোগায়॥
রাজা হইল ধর্ম পুরুষ কলি-জীব হইয়াছে বেহুঁশ
চেনেনা সেই ধর্ম-নিরঞ্জন।
চাল তেঁতুলে মেশে যেমন দুধে লবণ খাইলে যেমন
বিষের তুল্য হয় সে ভোজন॥

শুধু দুর্নীতির কথা জনসমক্ষে প্রচারই নয়, এই দুর্নীতিগ্রস্ত ভণ্ড দেশ সেবকদের দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিতেও তৎপর হয়েছেন লোক-কবিরা। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতে তখন দলে দলে চলে আসছে উদ্বাস্তু, তাদের সরকারী খয়রাতি সাহায্য আত্মসাৎ করা ছাড়াও এদের উপর পুলিশী নির্যাতনের করুণ কাহিনী কেবল লোক-কবিদের গানের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশের প্রকৃত অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁরাই। লোককবি গুরুদাস পাল তরজা গানের আঙ্গিকে এই ধরনের একটি গান গেয়ে রাজরোষে পড়েন, তৎসত্ত্বেও তাঁর গান বন্ধ হয়নি, বন্ধ হয়নি গণচেতনা বৃদ্ধিতে তাঁর গুরু দায়িত্ব পালনের কাজ। ভণ্ড দেশ-সেবীদের মুখোশ খুলে দিয়ে তিনি গেয়েছেন—

(৭৭)

আমি কত্তাভজার দলে—।
বাইরেতে বোষ্টুমী আমি ভেতরে দুর্নীতি চলে ॥
বাস্তুহারার ক্যাম্পে গিয়ে ভাসি চোক্ষের জলে
যদি কচ্চে বারো করতে পারি ইলেকশনটায় তলে তলে ॥
আমি হিংসার উপর বড্ড চটা মাঝে মাঝে করে ঘটা
বাক্যচ্ছটায় পটিয়ে লোককে ভিড়াই নিজের দলে।
গরীব গুর্বোর উপর ওই যে লাঠি গুলি চলে
সেটা তোমরা বুঝলে কিনা সেরেফ তাদের কর্মফলে ॥
আমি দিব্যি করে বলতে পারি ঐ যে পুলিশ মিলিটারী
ওরা শান্তিরক্ষার ধ্বজাধারী নায্য পথে চলে।
মাঝে মাঝে দুষ্টু লোকের কেলেঙ্কারীর ফলে
যত হাড়হাবাতের হুড় থামাতে খামোকা গুচ্ছের গুলি চলে ॥
লোকের মশাই এঁড়ে বায়না তারা নাকি খেতে পায় না
না খেলে কি বাঁচা যায়না বলুক তো সকলে ?
চোদ্দ বছর শুকিয়ে লক্ষ্মণের কি করে চলে
এতো আমার কথা নয়রে বাপু রামায়ণের নেকায় বলে ॥
আমি নাম ভাঙানোর গুরুমশাই চতুর্বর্গ জ্ঞানের গোঁসাই
বুদ্ধাশিষ্যের অস্থি ভাসাই বারানসীর জলে।

ইতরজনের সাইকোলজি বুঝতে পারার ফলে
আমার হোক না গাড়ীর চাকা ভাঙা হটরে হটরে তবু চলে ॥
যখন ফুটপাতে লোক টেঁসে থাকে খিদের ধকলে
পথের ধুলো উড়িয়ে আমার স্টুডিবেকার গাড়ী চলে
অমি একজন স্বদেশভক্ত আমার দুটি হাতে নারীরক্ত
আমি একটু শক্ত না হলে কি তখ্‌ত রাখা চলে ॥

একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনাবৃষ্টি, খরা আর ম্যালেরিয়ায় বাংলার গ্রামে গঞ্জে হাহাকার, পেটে দানা নেই, রোজগারের কোন পথও নেই, অন্যদিকে তখন এই সব বুভুক্ষু অসহায় মানুষগুলির সঙ্গে কালোবাজারীতে মেতে উঠেছে একদল কুচক্রী মানুষ। এদের কালোবাজারী মনোবৃত্তিকে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য মালদহের গম্ভীরা শিল্পী তাদের লোকায়ত দেবতা শিবকে উপলক্ষ করে গান বেঁধেছেন অত্যাচার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

(৭৮)

শুনরে ভোলা নানা প্যাটে নাইকো দানা
ক্যানে দিলি এমন সাজারে।
তোর ভূতের ব্যাগার খ্যাটা ভাত খাই আধ প্যাটা
হামার খাঁচা হয়্যাছে বুকের পাঁজারে ॥
এবারকার আকাশ হাতে[১] কালা আগুন[২] ঝরে
গাঁয়ের মানুষ উজার হল ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বরে
ভোলা বাঁচি ক্যামন করয়া রে ॥
আইল ম্যাগ শাঁসিয়া[৩] গেইল্‌ ধান ফাঁসিয়া[৪]
মহাজনের চোরা বাজারে।
ভোলা তুই তাদের করলি রাজারে।
সকলি দেখ্যা তবু নাক ডাক্যা ঘুমায় পড়্যা[৫] খায়া গাঁজারে ॥

শব্দার্থ : ১-হ'তে, ২-প্রচণ্ড রোদে ঝলসে যাওয়া, ৩-তুমুল বেগে বা মুষলধারে, ৪-নষ্ট হয়ে গেল, ৫-ঘুমিয়ে পড়ে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে গরীবদের অধিকাংশেরই দুবেলা ভাত জুটতো না। ভাতের বদলে খেতে হত আটার রুটি। রুটি খাওয়ার অনভ্যাস ছাড়াও সেই আটাতেও ওজনে কারচুপি করে সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলেছিলেন তৎকালীন সরকারী প্রতিনিধিরা। এর মধ্যে দুর্নীতি এমন বাসা বাঁধে যে অভাবী লোকের অভাব বেড়ে যায় আর অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা সম্পদের পরিমানে ফুলে ফেঁপে ওঠে। এই চরম অব্যবস্থার কথাই ধরা পড়ে লোকসঙ্গীতের শিল্পীদের গানে। একটি 'আলকাপ' গানে কার্তিক ঘোষ গেয়েছেন—

(৭১)

ধন্য রে ভাই কলিকাল টাকায় বিকায় সেরেক[১] চাল।
উত্তম লোক মধ্যম হল মধ্যম লোক উত্তম হল
উত্তম লোক হল কাঙাল টাকায় বিকায় সেরেক চাল॥
(সরকার) দেশে পাঠালেন আটা
সে আটা ভদ্রলোকে খায়
তার বাদে গরীব খায়।
যারা ভাই বাঁটছেন আটা তার কপালে মার ঝাঁটা
সে কি আসল বাপের ব্যাটা।
ওজন কমিয়ে দিচ্ছেন দাঁড়ি আটা কমে বাড়ী গাড়ী
সুখে তখন ছুটছে গাড়ী।
ভদ্দরলোকের এমনি ধারা ভারতকে করলেন সারা
অন্তিমকালে যাবেন মারা মারা গিয়ে হবেন ঘোড়া
গরীব লোক যাবেন ছাইড়্যা পিঠে তখন মারবে কোড়া[২]॥

জলপাইগুড়ি জেলার চূর্ণী নদীতে একবার বন্যায় পার্শ্বস্থ ঘরবাড়ী সব ডুবে যায়। গৃহহারা মানুষের জন্য সরকার খয়রাতি সাহায্য বরাদ্দ করেন, কিন্তু সেই টাকা প্রকৃত বানভাসি লোকেরা প্রায় কিছুই পায়নি, সব টাকাই

শব্দার্থ: ১-এক টাকায় এক সের চাল, ২-চাবুক।

আত্মসাৎ করেছিল তৎকালীন ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা। যারা সামান্য সাহায্য পেয়েছিল তাদেরও ঘুষ দিয়ে তবে অনুদান আদায় করতে হয়েছে। দেশের এই দুর্নীতির কথা স্মরণ করে জলপাইগুড়ি জেলার ছাতুয়া রায় একটি লোকসঙ্গীত প্রচার করে জনগণের মধ্যে এই দুর্নীতির কথা জানান।

(৮০)

এই বছর ওগো চুন্নী নদীত উটিল বান
এমত দুর্ঘটনা মানুষ গরু নিভলো কত লোকের পাণ।
চুন্নী লো ওলো চুন্নী গবরমেটি[১] দিলেক্ ট্যাহা
বান-ভাস্যার কোপাল পুড়্যা
কাকতো[২] মারিলেক্ মাজা[৩] আইল ডাঙ্গা ভাসান॥

চুন্নীগে ট্যাহা নিলেক মেম্বারগণ
ঘুষত্ নিলে অকারণ
ঘুষত নিয়া বাড়ীত্ বাজিছে রেড়িও গ্রামোফোন॥

চুন্নীগে পাট্টির য্যামোন আন্দোলন, মেম্বারগণের দুঃখ মন
ইয়ার[৪] আগে কান্দাকাটি করে মেম্বারগণ।
ওরে বাঁচাইও তুমি জান্ না বাঁচালে গেল মান
জনগণ ক্ষেপিয়া আচে বাঁচিব ক্যামন।
ইবার বুঝি শাস্তি হইবে বোডের মেম্বারগণ॥

দেশে কন্ট্রোল দরে জিনিস বিক্রীর যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, কেবল দুর্নীতি-পরায়ণ আমলাদের জন্যই এই প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিসই সরকারী রেশন দোকানে পাওয়া যেত না, রেশন-কার্ড নিয়ে কেবল ঘোরাঘুরিই সার হত, পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও রেশন দোকানে দেওয়া জিনিস অত্যন্ত নিম্নমানের। এই অবস্থার কথা লোক সমক্ষে জানিয়েছেন লোককবি নিবারণ পণ্ডিত।

শব্দার্থ : ১-গভর্ণমেণ্ট, ২-অন্যরা, ৩-মজা, ৪-এর জন্য।

(৮১)

আমার শশুর মা' য়ে তো কণ্টোল বুঝে না।
রাইন্তে[১] গেইলে কাইন্তে[২] বসে লবণ ছাড়া রান্দে না।
ও আহারে কার্ড লইয়া কত ঘুইরলাম[৩]
কত বাবুর পায়ে ধইরলাম
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে তবু লবণ পাইলাম না॥
ও আহারে আমার ভাঙা ঘরে নেড়ার ছানি[৪]
ম্যাগ না হাতেই পড়ে পানি
ও তার ট্যাপট্যাপানি[৫] গেইল না রে তার ট্যাপট্যাপানি গেইল্ না॥

লোকসঙ্গীতে যেমন বহিঃরূপ-প্রধান গান রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার অন্তঃরূপ-প্রধান গান। গম্ভীরায় শিবকে উপলক্ষ করে এই ধরনের বহু গান গীত হয়েছে যা সরাসরি প্রতিবাদী বা সমালোচনামূলক গান বলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে না হলেও, প্রকৃতপক্ষে এগুলির মধ্যে নিগূঢ় অর্থ লুকিয়ে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর এক অর্থ হলেও গূঢ় অর্থে এই সব গানের অর্থ স্বতন্ত্র। গণচেতনার গান সবসময়ে সরাসরি না গেয়ে তা কোনক্রমে দ্ব্যর্থ অর্থের আড়ালে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত।

নিম্নে উল্লিখিত আলোচ্য গানটি গম্ভীরার এইরূপ একটি অন্তঃরূপ প্রধান সঙ্গীত, যাতে শিবের বাহন বুড়ো ষাঁড়কে সামলে রাখার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গানটি জেলা শাসকের কাছে তার অঞ্চলের বুড়ো দারোগার কীর্তি-কলাপ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে এবং তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

(৮২)

শিব সামলারে তোর বুড়ো এঁড়ে
তাড়িয়ে মারে ঢিঁস রে।
তোর কান্দে ঝোলে ভিক্ষের ঝুলি
গলায় ভরা বিষ রে॥
কোচেরা সব শল্লা করে, তোর এঁড়ে দেবে খোয়াড়ে ভরে
তখন বাড়ী বাড়ী মাঙ্গন করে জরিমানা দিস্ রে॥

শব্দার্থ: ১-রাঁধতে, ২-কাঁদতে, ৩-ঘুরলাম, ৪-ধান বেটে নেওয়ার পর যে ধানের গোড়া থাকে তার ছাউনি, ৫-ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে বৃষ্টি পড়ার শব্দ।

১৮৫৭ সালে ইংরেজরা ভারত দখল করার পর অন্য ব্যবসা ছাড়া তাদের নজর পড়ে নীল চাষের উপর। বিঘের পর বিঘে জমি নীল চাষের জন্য বরাদ্দ করে দিল ইংরেজ বানিয়ারা। যারা নীল বুনতে চাইত না তাদের কপালে জুটতো অশেষ দুঃখ। জোর করে দাদন নিতে বাধ্য করে সারা জীবনের জন্য নীল চাষ করতে বাধ্য করতো গরীব কৃষকদের। যে জমিতে ধান চাষ করলে কৃষকের অন্নের অভাব ঘুচতে পারতো, সেখানে নীল চাষ করে ইংরেজ বানিয়াদের দেশে নীল চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই অবস্থা কালক্রমে এতই ভয়াবহ হয়ে উঠলো যে চাষীর মধ্যে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তৎকালীন সামাজিক দর্পণ হিসেবে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক অবিস্মরণীয়।

এই নীল-চাষে কৃষকের যে সর্বনাশ হচ্ছে তা নিয়ে যথারীতি লোক-কবিরাও সোচ্চার হয়েছেন সেই সময়ে। ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রেস থেকে প্রকাশিত লেখকের নাম-হীন এক পুস্তিকা তখন বাংলার ঘরে ঘরে আলোড়ন তুলেছিল। বইটির নাম, 'বাপরে বাপ্, নিলকরের কি অত্যাচার'। প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই এই পুস্তিকাটি নীল-চাষ-প্রধান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নাটকীয় সংলাপের চেয়ে পুস্তিকার গানগুলিই বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। রীতিমত সুর তাল সহযোগে কয়েকটি লোকসুরে গাওয়া গান রয়েছে পুস্তিকায়। বাংলার কৃষক সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কটময় মুহূর্তে নীলকরের অত্যাচারের অনাবৃত বিবরণ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এবং প্রজাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার প্রেরণা যুগিয়েছিল এই সব গান। সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন এই সব লোক-শিল্পী যে সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করেছেন, ইতিহাসের বিচারে তা স-প্রশংস স্মরণীয়।

এই পুস্তিকার ঐতিহাসিক মূল্য আরও বেড়ে যায় যখন ১৮৬০ সালের ১২ই জুন নীল কমিশনের সামনে রেভারেণ্ড জেমস লং এই বইটির কথা উল্লেখ করেন। তিনি সাক্ষ্যদানকালে বলেন 'গত ১৬ বছর ধরে এইসব দেশীয় পত্রিকাগুলি নীল চাষ ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং এগুলির মতামত জনগণের একটা বড় অংশকে প্রভাবিত করেছে'। এই পুস্তিকায় উল্লিখিত কয়েকটি গান—

(৮৩)

নীলকরের কি অত্যাচার।
এই নীলে নিলে সকল নিলে এদের লিলে বোঝা ভার ॥
ও নীলের দাদন, বিষম বাঁধন নাহিক নিস্তার।
বেচলে ভিটে, না যায় মিটে, কিবা মিঠে সন্ধ্যাভার ॥
ও জোর করে বিচ[১] ছড়ায় আগে ছাড়ায় কর্ম আর
হোল না ধান গেল যে মান, প্রাণ বাঁচান হলো ভার ॥
ও সুদে সুদে কেবা সোদে[২] তিন পুরুষের ধার
বেচলে পাটা না যায় লেঠা, কত ব্যাটা গঙ্গাপার।
হুত্তুর হো, হুত্তুর হো, হুত্তুর হো, হো হো ॥

(৮৪)

নীলকরেরা কত্তে দেয় না বাস।
যেমন নয় নিল গয় গবাক্ষে রাবণ রাজার সর্বনাশ,
ভিক্ষে কোরে কোরে এসে বাস, প্রজার হাড়ে গজায় দুর্বাঘাস
এরা দোহাই দস্তর নাহি শোনে দেখ ভদ্রাসনে[৩] লাগায় চাষ ॥
দেনা দেনা হেঁচকা[৪] বার মাস, যে অবধি হাড়ে থাকে মাস
এদের দাদন নিলে দেখায় লিলে[৫] দেখ শেষকালে দেয় বনবাস ॥

(৮৫)

নীলকরেরা হলো দেশের কাল
এই ছুঁচ হয়ে ঢুকেছে এরা শেষকালেতে হবে ফাল ॥
দেখ যত নীলকরের কুটি সেখান থেকে উঠে ভিরকুটি
এরা পেলে বসতে নাগে চোষতে[৬] খোসতে নাগলো[৭] পেরজার পাল[৮]
নালিশ করলে সালিশ নাজেহাল, মপসলে[৯] এরাই যেন সাল
এই বঙ্গভূমি সাঙ্গ করলে কতগুলো পঙ্গপাল ॥

শব্দার্থ: ১-বীজ, ২-পরিশোধ করে, ৩-বসতবাটিতে, ৪-দেনার দায়ে হেঁচকি ওঠে, ৫-লীলা-খেলা বা কেরামতি, ৬-চুষতে শুরু করে, ৭-খসে পড়লো বা মারা গেল, ৮-প্রজার দল, ৯-গ্রামে।

(৮৬)

দেখ নীলকরের যে দায়।
যে আদায় বিষম দায়, হয় দেশের সু-মঙ্গল হলে বিদায়॥
ছলেতে সর্বস্ব লোটে একথা না কোথাও ওটে
আইন (হল) সুপ্রিমকোর্টে দেখ রাজা বর্তমানে প্রজারে মজায়।
জমিদারের উপরি, তাদের চেয়ে আদায় ভারি, কিসে হবে মালগুজারি।
এই নীলে মিলে সম্বরণে দুখ যায়॥

(৮৭)

সদা নীলকর নিকরে করে জ্বালাতন।
ধন-প্রাণ জাতি মান হইল ক্রমে নিধন॥
শয়নে কিবা স্বপনে, সদনে অথবা বনে
থাকিতে সুস্থির মনে নাহি পারি একক্ষণ॥
নিশিতে মুদিলে আঁখি ভ্রমে শ্বেতরূপ দেখি
সভয়ে জীবন পাখী করে পলায়ন॥
বিষম যন্ত্রণানলে, মনপ্রাণ সদা জ্বলে
কাল অনুকূল হলে, জুড়ায় জীবন॥

অনাচার আর দুর্নীতির ফলে দেশের সাধারণ মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন তাদের মধ্যে দুর্নীতি পরায়ণদের শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলে সাধারণ মানুষ নিজেরাই তুলে নেয় শাস্তি বিধানের কাজ। এই শাস্তি বিধানের সংবাদ যাতে সকলের কাছে পৌছায়, যার ফলে শোষিত মানুষ যেমন সজাগ ও সংঘবদ্ধ হতে পারে আবার অন্যদিকে দুর্নীতিগ্রস্তরা যেন দুর্নীতি করতে ইতস্তত করে, সেইজন্য এই সব শাস্তির কথাও লোক-কবিরা প্রকাশ করেছেন লোক-সঙ্গীতের মাধ্যমে। সংবাদপত্রে যেমন সংবাদ পরিবেশিত হয়, এই লোক-কবিরাও তেমনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লোক-সমক্ষে শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মুখোশ খুলে দেয়।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালের একটি গ্রামে গ্রামবাসীরা তাদের ফুড কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদের কিভাবে শাস্তি দিয়েছে, তারই এক সরস

কাহিনী লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, গ্রামে-গঞ্জে। এ যেন দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এক গণ-সাবধান বাণী—

(৮৮)

শোনরে বলি কাইলা চাচা বরিশালের খবর খাসা
ফুড কমিটির প্রিসিডিংরে জোতার[১] মালা গলায় দিয়া ঘুরাইছে রাস্তায়।
(আবার) নূতান খবর পাওয়া গ্যাছে
(ও তার) রেশন কার্ড গলায় বাইন্দ্যা
চেনি[২] এট্টু হাতে দিয়া কেরাসিন ঢ্যায় মাথায় ॥
(আবার) নূতান কাপড় দিয়া গলায়
টাইন্যা বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়
বলি উচিত সাজা হইল এতকালে চাচা উচিত সাজা ॥

অনাচার ও অত্যাচারকারীদের অবস্থা কি হতে পারে, তার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় আর একটি লোকসঙ্গীতে। একসময় বাংলার সমুদ্র উপকূলে বিশেষতঃ ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই বোম্বেটে দস্যুরা জেলেদের ধরা মাছ যেমন লুঠ করতো তেমনি তাদের মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যেত, অত্যাচার করতো। এমনি একটি ঘটনায় একদল পর্তুগীজ দস্যু কিভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল জেলেদের কাছে তারই রোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় লোক-গীতিতে।

(৮৯)

শুনেন সগলে বলি এই সভাস্থলে
কয়েকজন জাইল্যা[৩] তথায় সাইগরে[৪] মাছ ধরে।
জাইল্যার লৌকায়[৫] ডাকুরা সব উডিল[৬] দলে দলে ॥
কেহ লইল পালের বাঁশ কেহ লইল পই
কেহ কেহ উজাইল ধামা দাও[৭] লই ॥

শব্দার্থ: ১-জুতার, ২-চিনি, ৩-জেলে, ৪-সাগরে, ৫-নৌকায়, ৬-উঠলো, ৭-দা (কাটারি) বড় ধরনের দা বা 'রামদা'।

দাঙ্গা শুরু হইল রে সেই ধু ধু বালুচরে
কারো মাথা ফাড়ি[1] গেল কেহ গেল মরে ॥
জাইল্যার মইধ্যে একজন বয়াসে সেই বুড়া
তাড়াতাড়ি লইয়া আইল মরিচের[2] গুড়া
মরিচের গুড়া আনি কী কাম করিল
মুট করি ডাকাইতের চোখে মেল্যা[3] দিল ॥
ভোম[4] খাইয়া পড়ে ডাকাইত বালুর উপর
পিটাইয়া ফ্যালায়া দিল জলের ভিতার[5] ॥

সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার ও পীড়ন হয় নানা ভাবে। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সাধারণ জনগণ কূট-কুশলী না হওয়ার ফলে তাদের শোষণ ও উৎপীড়ন করা হয় বিভিন্ন উপায়ে। কখনও বা রাজনৈতিক ভাবে কখনও বা আমলাতান্ত্রিক উপায়ে। রাঢ়বঙ্গের 'ভাদু' গানে এমনই এক গানের কথা পাওয়া যায় সেখানে সহজ সরল লোকগুলিকে বোকা বানিয়ে যে যার স্বার্থ সিদ্ধি করে নেয়, বিশেষতঃ রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দিকে লোক টানার জন্য নানা মিছিলে এই সব লোকজন ধরে নিয়ে আসে। তারা রাজনীতির কিছু না বুঝেই যেমন চীৎকার করতে বলে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা, তেমনিই চীৎকার করে—হয়তো বা সামান্য টাকাও পায় এজন্য।

'ভাদু' পূজায় গ্রামের মেয়েরা গানের মধ্যে এই অবস্থার কথাই ফুটিয়ে তুলেছে। তাদের সুখ দুঃখের সব অভিযোগ জানানোর জন্যই তো ভাদু। 'ভাদু' তাদের ঘরের দেবতা। ঘরের লোকের কাছেই তো সব খুলে বলা যায়। গানের মধ্যে মেয়েরা বলছে তুমি যেমন বলাচ্ছো, তেমনিই আমরা বলছি কিন্তু আমাদের অবস্থার কোন হেরফের হয় না।

(১০)

ভাদুধন চড়ক ঘুরাল্যো
ঘুরছি ফি সন পাকে পাকে ঠহর[6] না মিলে।
যা খুশী তা বল তুমি তড়াক[7] বলি হঁ

শব্দার্থ : ১-ফেটে, ২-লঙ্কা, ৩-চোখে ছুঁড়ে দিল, ৪-ভিরমি, ৫-জলের মধ্যে, ৬-বুঝতে পারি না, ৭-সঙ্গে সঙ্গে বা তৎক্ষণাৎ।

(আমরা) ডুবেছি কি ডুবতে বাকী কাঁয়ই জানি না ॥
'রাখ্ ধরম্ রাখ ধরম' বলে চেঁচা[১] করাল্যেক[২]
কী যে হব্যেক কে বইলবেক্ লাগোল[৩] না মিলে
আধ পাগলা পাঁয়ে[৪] মোদের আস্ত ডুবাল্যে ॥

জনগণের উপর অত্যাচারের কাহিনী লোক-কবিরা নানাভাবে শুনিয়েছেন জনগণকে। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যার হাতে থাকে নগর শাসনের ভার এমন লোকই কখনও হয়ে যায় জনগণের অত্যাচারকারী। গ্রামে গ্রামে নানা দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী যে, সে সরকারের প্রতিনিধি। এক সময়ে গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হত সালিশী সভা, ওখানের চণ্ডীমণ্ডপে বসত সেই বিচার সভা, সেখানে গাঁও-বুড়া বা গ্রামের মোড়লই বিচার করতেন। এই মোড়লদেরও ছিল নানা দুষ্কর্ম আর কু-কীর্তি, সেসবও ফাঁস করে দিতেন লোক-কবিরা। গম্ভীরা গানে সব কাজের কাজী বা সব দুঃখ-কষ্টের জন্য যেমন দায়ী করা হয় শিবকে—কিন্তু মূলতঃ এখানে শিব উপলক্ষ মাত্র, এ গানে তারই আড়ালে মুখোশ খুলে দেওয়া হয় দুষ্কৃতকারীদের।

(৯১)

ধব্ ধব্ ধব্ দিস না ছাড়্যা
লিয়া চলেক[৫] সঙ্গে কর্যা
ওই বুড়াহাটা দিলেক বড়ই দুখ হে।
ধান বুনিলে ত্যায় না পানি
ওই বুড়াহাটা বড়ই শণি
সদাই রাখে মোদের প্যাটে ভূখ হে ॥
দামড়ার উপর চড়্যা[৬] বুড়হা
কুচনী পাড়ায়[৭] বেড়ায় ঘুর্যা
ঠাট কুহারা[৮] জানে কতই তুক হে।

শব্দার্থ: ১-চীৎকার করালে বা শ্লোগান দিলাম, ২-আন্দোলন করালে, ৩-হিসাব পাই না (বুঝতে পারিনা), ৪-পেয়ে, ৫-সঙ্গে নিয়ে চল, ৬-ষাঁড়েব উপর চড়ে, ৭-কোচ-রমণীদের পাড়ায়, ৮-হাসি মস্করা।

জ. সমাজ সংস্কারমূলক গান

বাংলার লোকসঙ্গীতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। দেশের সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার চিত্ররূপ লোকসঙ্গীতেও ফুটে উঠেছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট উত্তর কলকাতার তৎকালীন আপার চিৎপুর রোডে রামমোহন রায় 'ব্রহ্মসভা' বা 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডে 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে'র নিজস্ব উপাসনা গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে রামমোহন সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত এই মন্দির ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও অনন্ত-অক্ষয়-সত্তার আরাধনার নিমিত্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উপাসনার স্থান হিসাবে নির্দেশ করেন। বল্লাল সেন আমলের বর্ণাশ্রম প্রথার বাইরে সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন রামমোহন, যেখানে জাতিভেদ নেই এমন অবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হন এবং লোক-কবিরাও এই ধর্মমতে সকলকে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানান। কারণ এই সময় খ্রীষ্টান মিশনারীরা হিন্দু ধর্মের দরিদ্রশ্রেণীর লোকদের নানা আর্থিক লোভ দেখিয়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা শুরু করেছিলেন।

(৯২)

ডোম মুচি বাগদীরা আর হয়োনাকো খ্রেস্তান[১]।
নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন মোদের রামমোহন ॥
দেশের যত গেয়ানী[২] লোকেরা
নতুন ধর্মে সবাই মিলে যোগ দিয়েছেন ॥
গোড়ামির ভাই ঠাঁই নেই এতে
জেতের বিচার নেইও তাতে।
ছোট বড় ভাই সকলেই মানুষ
অধিকার ভাই সকলেরই আচে ॥
আর দেরী নয়, নতুন ধর্মে দীক্ষে নিয়ে নি ॥

শুধু ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনই নয়, হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় রামমোহন রায় আরও একটি সংস্কার সাধন করেন। সতীদাহ প্রথা আইনতঃ বন্ধ করা হয়। সংস্কৃত

শব্দার্থ : ১-খ্রীষ্টান, ২-জ্ঞানী।

ভাষায় 'সতী' বলতে পূত চরিত্র ও স্বামীর প্রতি একাগ্র তথা পতিব্রতা স্ত্রীকেই বোঝায়, কিন্তু বহু স্মৃতি-শাস্ত্রকারেরা স্বামীর সঙ্গে সহমরণকে মোক্ষলাভের উপায় বলে নির্দেশ করেন, যদিও মনুসংহিতায় এই ধরনের কোন বিধান নেই। ভারতে সতীদাহ প্রথা আর্য ও অনার্য উভয় নরগোষ্ঠীর মধ্যেই সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল কিন্তু এত দীর্ঘকাল এই প্রথার প্রচলন কেবল হিন্দু সমাজেই ছিল। এই অ-শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রতিরোধে রামমোহন সচেষ্ট হন এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আদেশে সতীদাহ প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়।

সমাজ সংস্কারের এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্বাগত জানিয়ে লোক-কবিগণ গান রচনা করে জনচেতনা বৃদ্ধি করেন, যদিও 'সতীদাহ' প্রথা রদের বিরুদ্ধে তৎকালীন সমাজপতিদের একাংশ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তবুও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গণচেতনা বৃদ্ধিতে গ্রামীণ লোকশিল্পীগণ কুন্ঠিত হন নি। 'বয়াতী'র গানে এমনই একটি গানের উল্লেখকরা যায়, যাতে সতীদাহ প্রথাকে রদ করার সমর্থনে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।

(১৩)

শোন শোন শোন সবে নর নারীগণ
সহমরণ পেরথা[১] নারী বধেরই কারণ।
নারী হত্যে মহাপাপ শাস্তের[২] বচন
নারী রক্ষে মহাকর্ম মহৎ কারণ॥
(ওগো সতী) স্বামী মল্লে তোমাদের চিতেয় যেতে হয়
তোমরা মল্লে পুরুষেত কেউ সঙ্গেতে না যায়।
সতী গভ্ভে[৩] রেখে সন্তান যদি স্বামী চলে যায়
বল কোন দোষে নবশিশু যাবে যমালয়?
খুন করলে খুনী শুনি ফাঁসিতে লটকায়
জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মাল্লে জেনো নরকগামী হয়।
তাই কলির রাম রামমোহন দিয়েচেন ডাক
নারীবধ রোধ তরে বাজাও সবাই ঢাক॥

শব্দার্থ: ১-প্রথা, ২-শাস্ত্রের, ৩-গর্ভে।

সমাজ সংস্কারের আরও একটি রূপ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই দিক বিচার করে লোক-কবিরাও এতে সামিল হয়েছেন। তৎকালীন হিন্দু বিবাহের পদ্ধতি অনুযায়ী বিধবাদের বিয়ের কোন সংস্থান ছিল না বরং এই ধরনের বিয়ের প্রস্তাব সর্বত্র অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। গৌরী-দানের প্রথা অনুযায়ী মেয়ের আট বছর বয়সে তাকে কোন কুলীনের ছেলের হাতে সমর্পণ করলে কন্যার পিতামাতা অসাধারণ পুণ্যের কাজ করতেন বলে মনে করা হত। কিন্তু পাত্র যদি বৃদ্ধও হয় তাতেও কোন আপত্তি নেই কারণ কুল রক্ষা করতে হবে। অতঃপর বৃদ্ধের মৃত্যু হলে সেই অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার আজীবন বৈধব্য পালনই ছিল শাস্ত্রের বিধান—যদি না তাকে কোনওক্রমে স্বামীর সহমরণে সঙ্গী করে দাহ করা যেত। এই চরম ঘৃণিত ও পাশবিক সমাজ ব্যবস্থার সংস্কারে রামমোহনের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাকে সাধারণ মানুষ সমর্থন জানায়, এমন কি বিধবা বিবাহের প্রস্তাব পেশের সময় থেকেই নদীয়া জেলার শান্তিপুরের তাঁতী সম্প্রদায় শাড়ী কাপড়ের পাড়ে পক্ষী রচিত এই কথা বুনে দিত,

'বেঁচে থাক (সুখে থাকুক) বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।' অর্থাৎ যে সমাজ সংস্কারের প্রস্তাবে হিন্দু সমাজের সমাজপতিরা করেছিলেন চরম বিরোধিতা, সেই সংস্কারকে মুক্তমনা লোককবি জনগণের মুখপাত্র হয়ে সাগ্রহে সমর্থন করেছেন। সামাজিক এই সংস্কারের পক্ষে ও বিপক্ষে একদিকে যেমন সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল, অন্যদিকে তেমনি লোক-সাংবাদিকরাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সংস্কারের পক্ষাবলম্বী হয়ে।

(১৪)

ওরে বিদ্যেসাগর দেবে বিয়ে বিধবাদের ধরে
তারা আর ফেলবে না চুল বাঁধবে বেণী গুঁজবে রে ফুল
শাঁখা শাড়ী পরবে নতুন করে ॥

হায়রে ঐ বেজো মণ্ডল
বেটা বলবে তবে নেহাৎ গাড়ল
শয়তানি সব যাবে চুলোর দোরে ॥
বেটা বলে কিনা বিদ্যেসাগর নিরেট বোকা
একেবারেই মাথা মোটা
নইলে বিধবাদের এমনি করে, বসাতে চায় আদর করে ॥
দেখরে বেটা চেয়ে এবার
নতুন কনে চললো সেজে নতুন বরের ঘর।
উলু দ্যাওগো জননীরা বধু ন্যাওগো ঘরে
ঘষা সিঁথেয় নতুন করে সিঁদুর দ্যাওগো ভরে ॥

সমাজ সংস্কারের অন্যতম সংস্কার হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার। যদিও ভারতবর্ষে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ দিকে রাজপুতানায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়, তবে বাঙলা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার আসে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতই বাঙলার ঘরে ঘরে প্রচারলাভ করে। বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথাও জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে ঈশ্বররূপে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। এমন কি এই ধর্মমতে স্ত্রী ও পুরুষেরও সমানাধিকার। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মমত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' হিসাবে পরিচিত, এই ধর্মমতে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও গদাধর এই পাঁচজন 'পঞ্চতত্ত্ব'রূপে পূজিত। এই বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রবর্তনেও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় বাণীতে এসেছে কৃষ্ণ প্রেমের জোয়ার, তাই 'কৃষ্ণনগর ডুবু ডুবু, ন'দে ভেসে যায়।' বাংলার লোককবিরাও গা ভাসিয়েছেন এই প্রেমের সাগরে, ছোট জাত আর উঁচু জাতের বিভেদ ঘুচিয়ে তাই জাত-হীন বাউল গেয়েছেন—

(৯৫)

ও ভজহরি মধুসূদন মাহাতো
ছোট জেতে জন্মেছি বলে, আর দুক্ক কোরো নাকো[১]।

শব্দার্থ: ১-দুঃখ কোর না।

গৌর নেতাই দু-ভাই এসে, হরি নাম বিলুচ্ছে[১] দেশে দেশে
জেতের বিচার নেই তার কাছে।
সকলকেই দিচ্ছে কোল
যে জন বলছে হরিবোল ॥

সমাজ সংস্কারের আরও একটি দিক বাল-বিবাহ রদ বা 'সর্দা আইন' পাশ। এই সম্পর্কে রায় সাহেব হরবিলাস সর্দা আইন সভায় বিল পেশ করেন, তারই ভিত্তিতে 'সর্দা অ্যাক্ট' পাশ হয়। হিন্দু বিবাহ পদ্ধতিতে প্রাচীনকালে গৌরী দানের প্রচলন ছিল, এই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিবর্তন করে বিয়ের কনের বয়স অন্ততঃ ১৪ বছর করে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সাধারণ ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাশ করা হয়। তথাকথিত-ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী এই আইন সাধারণভাবে সকলে সমর্থন করেনি, ফলে আইন বলবৎ হওয়ার আগেই তাড়াহুড়া করে অন্তত এক হাজার মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় কেবল জলপাইগুড়ি জেলাতেই। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এই বাল-বিবাহ বন্ধের বিষয়ে অভিমত হল—এতে মেয়েদের চরিত্রদোষ ঘটবে এবং প্রেমজ বিয়ের বাহুল্য দেখা যাবে। এছাড়া রাজবংশী সমাজে বিয়েতে বরপণ দেওয়ার প্রথা রয়েছে অর্থাৎ মেয়ের অভিভাবককে ছেলের পক্ষ থেকে পণ দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে পণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ছেলেরা বিয়ে করার সুযোগ পাবে না এবং মেয়েরাও অবিবাহিত থাকবে। এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলার মান্তাদাড়ি গ্রামের করুণা সিংহরায়ের গানটি এইরূপ :

(৯৬)

ওরে আইছে রাইনের[২] ধারা
হুকুম হইবে কাড়া কাড়া[৩], গাজিবে দুলাহার বাড়ী
নাই তো নাই বেহা।
ওরে ছোড কইন্যা ছোড বর, বেহাও স্থাওরে এই বছর
আর সন হইতে ছোড কইন্যার গাপথোর[৪] রে
তাবত বেহা হবেক নাই।
ওরে বাড়ুক বেটি গম গায় গতরে[৫] থম্ থম্
খাড়া টং টং হোক চ চ গাবুর[৬] হোক মচ্ মচ্।
ঝুলকুক[৭] হোক তার তন[৮] টাল চিনির মতোন গন
ধরুক বেটি বাশ খেলেবা অবতার চলন হেন্।

শব্দার্থ : ১-বিলাচ্ছে (বিতরণ করছে), ২-আইনের, ৩-কড়া, ৪-বন্যা রজঃশীলা হওয়া পর্যন্ত, ৫-শরীরে মোটা-সোটা ৬-জামাই, ৭-ঝুলুক, ৮-স্তন ভারী হয়ে যাবে।

ধন্যরে আরামক ভক্তি, বন্দি তার চরণ
ওরে কলিকালেতে কাজের বেটি
ভাই চান্দোরে[১] ভাতার[২] ওকি ও মরিরে ওরে ধন্য
আয়ান ধন্য যারে বেটি, বাড়ুক বাপের বাড়ি
অ্যালাও তো তিনশ পণ, হাজার ট্যাহা নাগিবে রে বেটির পণ।
মোর আর সন আর হু সন
ওরে যারে বেটি[৩] পহিলা মাল[৪]
তারে হোবে খোবে গাল[৫] বন্দনা করিবে তায়
ওরে সংসারেতে নাগিবে বুঝি পীরিতের জ-জকার[৬] ॥

ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নতির পথে বিরাট বাধা। এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারী পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করা হয়। ভারতের জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধির হার শতকরা ১ ভাগ হতেই ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই পরিমাণ একশো কোটি ছাড়িয়েছে। স্বভাবতই এই জন্মহার হ্রাস করা অবশ্য কর্তব্য। পারবার পরিকল্পনা কর্মসূচী প্রথম সূচিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিন শহরে, মার্গারেট সিঙ্গারের প্রস্তাবানুযায়ী।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনক হলেও সাধারণ মানুষের কাছে এই পরিবার নিয়ন্ত্রিত রাখাকে সমর্থন করেনি অনেকেই। একারণ দেশে নানা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সরকারের পক্ষ থেকে পরিবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে তাই প্রয়োজন হয় নানা ব্যক্তি ও সংস্থা নিয়োগ করার যারা পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ করবে। এইজন্য নিয়োজিত নানা ব্যক্তি নানা প্রলোভনে জনগণকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। স্বভাবতই এদের প্রতিও জনগণ বিরূপ হয়ে ওঠে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাই লোককবিরাও সোচ্চার হন। চক্রান্তকারী রমাকান্ত কিভাবে সবাইকে পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণে নানা পরামর্শ দিচ্ছে তা নিয়ে লোক-সঙ্গীত—

শব্দার্থ—১-খুঁজতে, ২-স্বামী, ৩-যার কন্যা, ৪-পবিত্র, ৫-গর্বে গাল ফুলে যাবে, ৬-প্রেমের জয়-জয়কার।

(১৭)

সঠিয়া[১] রমাকান্ত।

সঠিয়া রমাকান্ত কি চক্রান্ত করিয়া ফেলিল

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কথা তুলিয়া ধরিল।

বেশী ছাওয়াল[২] হলে।

বেশী ছাওয়াল হলে যায় আকালে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া

টাইট ফিট রাখতে হলে পরো জাঙ্গিয়া।

পরো টাইট বডিস[৩]।

পরো টাইট বডিস যত লেডিস বেঁধে ফেল বুক

খাদ্যাভাবে গরীবের শুকাইল মুখ ॥

ঝ. সামাজিক অবক্ষয়ের গান

বহু জাতি ও ধর্মের এই দেশ ভারতবর্ষ। রয়েছে বহু ভাষাভাষীর জন-সম্প্রদায়। এদের প্রত্যেকেরই আচার আচরণ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু সকলে মিলে এক সঙ্গে বসবাস করাই ভারতের জাতীয় সংহতির লক্ষণ। সমাজ ব্যবস্থায় নানা প্রক্রিয়া, জাতিভেদে নানা আচার-আচরণ। কিছু সঙ্কীর্ণ স্বার্থে এই সার্বজনীন সমাজ ব্যবস্থায় দেখা দেয় নানা অবিচার ও কুসংস্কার, দেখা দেয় জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ। এই জাতিগত বিভেদের ফলে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতা, একে অন্যের প্রতি অসূয়া, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা। অনেক সময়েই এই পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টির মূলে থাকে অন্য কোন তৃতীয় শক্তি।

সামাজিক এই অবক্ষয়ের যাতনায় ব্যথিত হয়ে এই জাতিতে জাতিতে বিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন নানা সাধক সম্প্রদায়, সেই সঙ্গে লোক-কবিরাও। সাধক কবি ও লোক-শিল্পী লালন ফকির এই জাতি বিভেদের চরম বিরোধী হয়ে তার গানে তুলে ধরেছেন জাতি-বিভেদের অসারতার কথা। অ্যান্টনি কবিয়ালও গেয়েছেন :

'ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন, অন্তিমে সব একাঙ্গী'। অর্থাৎ বাহ্যিক জীবনেই

শব্দার্থ : ১ শঠ বা চক্রান্তকারী, ২-ছেলে (এখানে সন্তান অর্থে ব্যবহৃত), ৩-আঁটো সাঁটো অন্তর্বাস।

যত ভেদাভেদ, জীবন শেষে সব ভেদাভেদ ঘুচে যায়। লালনের কথায় জন্মের সময় একটি জাতি হিসাবেই সবাই জন্মায়, সে জাতি মানব জাতি, তারপর শুরু হয় মানুষী—বিভেদ। এই সামাজিক অবক্ষয়ের কথাই বাংলার বাউল কবিরাও গেয়েছেন বার বার।

(১৮)

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন বলে জাতির কীরূপ, দ্যাকলাম না এই নজরে॥
কেউ মালা কেউ তসবি গলে
তাইতে রে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়, জাতের চিহ্ন রয় কারে?
ছুন্নত দিলে হয় মুছলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান?
বামুন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে॥
জগৎ বেড়ে জাতির কথা, লোকে গল্প করে যথা তথা
লালন বলে জাতির ফাত্‌না ডুবিয়েছে সাধ-বাজারে॥

সাম্প্রদায়িকতার ভেদ-বুদ্ধিতে ইন্ধন যুগিয়েছে ভারতীয় রাজনীতিও, দেশ বিভাগের ফলে হিন্দু ও মুসলমান জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায় বৃটিশরাজ তার কুট-কৌশলের ফলে। 'র‍্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ' অনুযায়ী ভারত সীমানার বিভাজনে দাঙ্গা বাধে হিন্দু-মুসলমানে। এই চরম কুটনীতির খেলায় শিকার হয় দুটি সমাজ ব্যবস্থার জনগণ। লোককবিরা এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেয়েছেন—

(১৯)

দ্যাশের কত হোমরা চোমরা ভুল্যা নিজ ধর্ম
বিদ্যাশীর চালে পড়্যা দেখলে সুখ-স্বপ্ন।
র‍্যাডক্লিফের কবলে আর রাজনীতির খ্যালে
(তারা) ভারতকে দিলে কিস্তিমাৎ কর‍্যা হে॥
কাঁদতে ছিল মণ্টা (তাই) চোখে পল কুট্যা
(দিলে) হিন্দু নিধন পালা শুরু কর‍্যা হে॥

সামাজিক অবক্ষয়ের আর এক রূপ পণ-প্রথা। হিন্দু সমাজে মেয়ের বিয়ে দিতে বরপক্ষকে পণ দিতে হয়। অর্থাৎ অর্থ বা অনুরূপ তৈজসপত্রের দ্বারা বরকে কিনে নেওয়ার মত অবস্থা। কন্যার পিতা এজন্য নিজের ঘরবাড়ী পর্যন্ত বন্ধক দিতে বাধ্য হন। ধার করে কন্যার বিয়ে দেওয়া তো মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ঘরের স্বাভাবিক ঘটনা। এই পণপ্রথার বিষময় ফলের কথা লোককবিদের গানেও ধরা পড়ে।

(১০০)

কত মেয়ে নিয়ে —।
কত মেয়ে নিয়ে দায় ঠেকিয়ে আছে ঘরে ঘরে
হাজার ট্যাহা পণ না দিলে ছেলে নাই সংসারে।
তারপরে সাইকেল ঘড়ি —।
তারপরে সাইকেল ঘড়ি আংটি চুড়ি মেয়ের গলার হার
বাসন পত্তর এক পরস্থ আরও ট্যানজিস্টর॥

রাজবংশী সমাজে আবার বরপণের পরিবর্তে দিতে হয় কন্যাপণ। অর্থাৎ ছেলের অভিভাবককে টাকা দিতে হয় মেয়ের অভিভাবককে। এজন্য ছেলেরা মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে কিন্তু সেই টাকা পরিশোধের জন্য তাকে মহাজনের কাছে মজুর খাটতে হয়। সামাজিক ব্যবস্থার এই বিষময় দিকে আলোকপাত করা হয়েছে জলপাইগুড়ি অঞ্চলের লোকশিল্পী সুলোচনা রায়কতের গাওয়া একটি গানে।

(১০১)

আজি ধার করিয়া করলুঁ বিহো।[১]
মাহাজনটা পাক পাড়েছে[২], ওহো গে নোদারী[৩]
বড়য় দুস্কে[৪] যাছুঁ গে চাখিরী[৫]।
আজি আজার জ্বালা বিষম জ্বালা
আতি পোহাইলে নাগে ট্যাহা গে
ওহো গে নোদারী বড়য় দুস্কে যাছুঁ গে চাখিরী॥

শব্দার্থ : ১-বিয়ে, ২-ঘুরে বেড়াচ্ছে, ৩-নতুন বৌ, ৪-দুঃখে, ৫-চাকরী।

লোভের বশবর্তী হয়ে কন্যার পিতা মাতা অনেক সময়েই অপাত্রে কন্যা সন্তানকে তুলে দিতেন। রাজবংশী সমাজে এমনই এক সমাজচিত্রের ছবি উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 'চট্‌কা' গানের লোকশিল্পীদের গলায় শুনতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ায় অল্পবয়সী কন্যার দুর্গতির কথা চমৎকার ফুটে উঠেছে এ গানে। সমাজের অবক্ষয়ী অবস্থার এ এক করুণ চিত্ররূপ।

(১০২)

ও তুই ট্যাহা খায়্যা তোর মুখোত বাঁধিলুঁ ডাঙ্গাও[১]
তোর গে আই।[২]
এমন বেসালেন[৩] জায়োাই[৪]
আর মুলুকত বরগে পালেন নাই।
ও আই, ট্যাহার নোভাত[৫] বুড়াক দিলেন
আর মুলুকত্ বর নাই পালেন
মোক কি সগায়[৬] কয় বুড়ি আই[৭]।
সগগায় কয় জ্যাঠাই-খুড়াই
কাহো কছে 'বুড়ি আই' 'বুড়ি আই'
নোদারী[৮] কবার গে মানষি নাই।
ও আই সাজি বুড়ার গুয়া পান
বুড়া বরের ফেদেলান[৯]
গুয়া ডুমাইতে[১০] যাবে জান গে আই॥

সামাজিক কুসংস্কারের আরও একটি নমুনা 'মায়ের দয়ার' চিকিৎসার অবস্থা। গ্রামে গঞ্জে বসন্ত রোগ দেখা দিলে লোকে শীতলা পূজা করে। কেউ কেউ আবার শীতলার থানে হত্যা দিয়ে মায়ের 'ভারে' পড়ে। অর্থাৎ মা শীতলা তাদের দেহে ভর করেন। এই লোক-বিশ্বাসের মূলে রয়েছে কিছু কুসংস্কার আর এর ফলে বসন্ত রোগ সারার চেয়ে তা মহামারীর আকার নেয়। এই 'ভারে' পড়া ব্যক্তির হাতের জল আর তেল সিন্দুর ঘরে ঘরে পৌঁছে

শব্দার্থ : ১-মুখে কুলুপ এঁটেছিস, ২-দিদিমা, ৩-জোগাড় করেছেন, ৪-জামাই ৫-লোভে, ৬-সবলে, ৭-বুড়ি দিদিমা, ৮-নতুন বৌ, ৯-ফোকলা দাঁত, ১০-সুপারী-কুচি কুচি করতে।

দেওয়া হয় ফলে বসন্ত রোগের জীবাণু অন্যের দেহে সংক্রামিত হয় জল, তেল ও সিন্দুরের দ্বারা। এই কুসংস্কার বা সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে গণচেতনা বৃদ্ধিতে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে বাংলার চারণ দল—লোকসঙ্গীত শিল্পী। এঁরা এই ধরনের আচরণের নিন্দা করে জনগণকে সজাগ করে তোলে এই বুজরুকির বিরুদ্ধে।

(১০৩)

শীতলা দেবীর দয়ায় আদমরা[১] হলাম সবাই
তাও কি মোদের ঘুম ভাঙে না, দেবীর নামে দিস্ দোহাই।
দেশের যত চাষা ভণ্ড
(করে) সর্বনাশের কাণ্ড
তারা দেবীর নামে পয়সা চায়॥
(আবার) ইট পাথরে সিন্দুর লেপ্যা
বাড়ী-বাড়ী লোক ঠকায়॥
কারো মায়ের দয়া[২] হলে
তার পূজা দেয় সকলে
তারা এমনি কর্যা রোগ ছড়ায়॥
আবার রোগী হয় বসন্ত দেবী
তার হাতে সব প্রসাদ খায়॥

কলকাতায় এক সময় শুরু হয় নানা বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলা মূলতঃ রাজনৈতিক হানাহানির ফলেই সৃষ্টি হত। একদিকে শহরের শান্তিরক্ষাকারী পুলিশ অন্য দিকে রাজনৈতিক দলের লোকজন পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতো। এই হাঙ্গামা দমন করতে পুলিশও নেমে পড়তো শান্তিরক্ষায়, ফলে নতুন করে হাঙ্গামা শুরু হত। সেই অবস্থারই এক চিত্র ফুটে উঠেছে ভাদু গানে—

(১০৪)

আমার ভাদুর একটি ছেলে
এমন করে কলকাতা কে পাঠালে।

শব্দার্থ : ১-অর্ধমৃত বা আধমরা, ২-বসন্ত রোগকে গ্রামে বলা হয় 'মায়ের দয়া'।

কলকাতাতে চারিদিকে গো হচ্ছে যে বিশৃঙ্খলে
দলে দলে হাঙ্গামা বেঁধে ছুঁড়ছে যে ইট পাটকেলে ॥
রাস্তাঘাটে ফুটছে বোমা কি আছে কি কপালে
কি উপদ্রব করছে বলিগো ঢুকে গিয়ে ইস্কুলে।
আসবাবপত্র তচনচ করে দিয়ে যে যাচ্ছে চলে
পুলিশ ছুটাছুটি করে গো গিয়ে ঘটনাস্থলে।
ছাড়ে কাঁদুনে গ্যাস চালায় লাঠি গ্রেপ্তার করে সকলে
এমন করে কলকাতা কে পাঠালে ॥

ঞ. শ্লেষাত্মক সঙ্গীত

সমাজ ব্যবস্থা ও একশ্রেণীর মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানা শ্লেষাত্মক রচনা পাওয়া যায় সমাজ সংস্কারক ও চারণ দলের লোক-সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে। 'ন্যায্য কথা পষ্ট করে' বলার মত মনের জোর নিয়েই এঁরা রচনা করেছেন নানা শ্লেষাত্মক সঙ্গীত। মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটাকে চরম আঘাত করে তাদের সুপ্ত 'ভাল-মানষি'কে জাগিয়ে তুলতে এই লোক-কবির দল যাত্রায় 'বিবেকে'র ভূমিকা বা সংবাদপত্রের সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেছেন।

কৃষক সম্প্রদায় যখন জমি রক্ষায় ও বিদেশী শাসকদের অপশাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবন-পণ করে লড়াইয়ে নেমেছিল তখন এক শ্রেণীর বাবু সমাজ দূর থেকে এই লড়াই উপভোগ করতে দলে দলে হাজির হয়। এদের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক সঙ্গীত রচনা করে দেশ দেশান্তরে লোকসঙ্গীত শিল্পীগণ এই আত্মসুখী বাবু সমাজের মুখোশ খুলে দেন।

(১০৫)

মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি
রইল সব হুদোর আঁটি
কইলকেতার বাবু ভায়ে, এল সব বজরা চেপে
লড়াই দেখবে বলে।

বাবু সমাজের আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার উচ্চশ্রেণীর লোকের মোসাহেবী করা। নিজেদের অত্যন্ত হীনভাবে পরিচয় দিয়ে তার বাবুর গুণগান করার মনোবৃত্তি এই মোসাহেবী। চাটুকারিতার এই চরম দিককে ব্যঙ্গ করেও লোক কবিরা তাঁদের গান বাঁধেন। লোক-কবি গুরুদাস পাল তরজা অঙ্গের একটি গানে এই সব মোসাহেবদের প্রকৃত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

(১০৬)

যেমন জলের স্বভাব নিম্ন গতি
আগুনের স্বভাব পোড়া।
বিড়ালের স্বভাব হাঁড়ি খাওয়া
পাখীর স্বভাব ওড়া ॥
বেশ্যার স্বভাব যেমন ধরা
চার আনাতে স্বামী।
এদের স্বভাব তেমনি ধারা
ধনিকের গোলামী ॥

শ্লেষাত্মক রচনায় সামাজিক অবস্থারও চরিত্র ফুটে ওঠে। প্রেমে পাগল হয়ে যে কন্যা আনন্দে বিয়ের পিঁড়িতে বসে ভবিষ্যতে তার জীবন কতটা দুর্বিসহ হতে পারে তারই এক কৌতুককর অথচ করুণ কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায় লোকসঙ্গীতের শ্লেষাত্মক রচনায়। সমাজ চেতনার দায়িত্ব পালনে এই সব লোকসঙ্গীত-শিল্পী জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহের উপরও আলোকপাত করেছেন। অভাবের তাড়নায় দুবেলা ভাতের আশায় যে কন্যা বিয়েতে রাজী হয়, অভাবী সংসারে সেখানেও হতভাগা পুরুষের হাতে পরে মেয়েটির জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে, এমনই এক করুণ অথচ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কথা পল্লীর চারণ কবিরা গেয়েছেন নানা সময়ে।

(১০৭)

হাউসত[১] থাকি বসিনু কাইন্[২] রে
ও মুঞি ধানের ভাতের আশাত্[৩]।
ও মুঞি ধানের ভাতের আশাত রে।
ওই ধানো নাই চালও নাই কিলায়[৪] মাসে মাসে রে ॥

শব্দার্থ : ১-আনন্দে, ২-বিয়ে, ৩-আশাতে, ৪-কিল মারে অর্থাৎ মারধোর করে।

কিলাইতে কিলাইতে মুনসারে
মোর পিঠিত করিলে কুঁজরে
মোর পিঠিত করিলে কুঁজ।
ওই গাঁও-বুড়া[১] উটিয়া কয় কাইনের মজা বুজ[২] ॥

মানুষের দুর্দশাকে কাজে লাগিয়ে আপন আখের গোছাতে একদল মেকী সমাজসেবী ছড়িয়ে পড়েছিল এক সময়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসে ভারতে আস্তানা গাড়ে। তাদের সুখ সুবিধা দেওয়ার নামে এই সব মেকী সমাজসেবীরা আপন স্বার্থসিদ্ধি করে। এমনি সব সমাজসেবীদের আসল মুখোশ খুলে দিয়েছেন লোক-কবিগণ। মালদহের লোকগানে এমনি এক সমাজসেবীর ছবি তুলে ধরেছেন লোককবি। যেন কোনও এক সমাজসেবী ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে লোকের বাড়ী গিয়েছেন চাঁদা চাইতে। এই চাঁদা নেওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য, সমাজসেবা সম্পূর্ণ ভাঁওতা। এই মেকী সমাজসেবীর কথাতেই লোক কবি গাইছেন—

(১০৮)

আইলাম দুপ্পহরের রইদে[৩] তাত্যা পুড়্যা।
দ্যাওনা চাঁদা জলদি কইর‍্যা ॥
সুবিদাবাদীর দলে, আমার মতন মাইয়া-ছেলে
দল পাকেয়্যা[৪] হইছে দ্যাশের সেরা ॥
যারা শুদু কাজ করে, দিবা রাইতে খাইটে[৫] মরে
আমি তাদের বলি আস্ত ভেড়া।
এই দুনিয়ায় কেবা আছে স্বার্থ ছাড়া।
দ্যাওনা চাঁদা জলদি কইর‍্যা ॥

বাঙালী ব্যবসা-বিমুখ বলে অখ্যাতি দীর্ঘ দিনের। কোন রকমে ডিগ্রী নিয়েই একটি চাকুরীর সন্ধানে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এজন্য চরম লাঞ্ছনা সহ্য করতেও তারা পশ্চাদপদ হয়না। এই অবস্থাকে শ্লেষ করে শশিভূষণ দাস তাঁর 'স্বদেশী চাবুক' গানে লিখেছেন—

শব্দার্থ—১-গ্রামের মোড়ল, ২-বোঝো, ৩-রোদ্দুরে, ৪-দল বেঁধে, ৫-খেটে বা পরিশ্রম করে।

(১০৯)

গোলামখানীর[১] বিদ্যাবাগীশ বি এ পাশের দল
ভেড়ার পালের মত ফেরে মাড়িয়ে ধরাতল।
ডঙ্কা মেরে বেরুলেন যখন গোলামখানা থেকে
ডরায়ে[২] উঠে পথের লোক গরম মেজাজ দেখে॥
চাপরাশ এঁটে চললেন বাবু চাকরীর উমেদার
'মধ্যম নারায়ণ' একটি শিশি পকেটে আছে তার।
সাহেব দেখে সেলাম ঠুকে করেন তেল মালিশ পায়
বলেন চাকরী একটা দাও গো গোরা[৩] পেট চালান দায়

ট. বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিষয়ক গান

বাংলার মাটির মানুষ লোক-শিল্পী দল বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিতে গড়ে উঠলেও সমসাময়িক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রয়েছে। সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশের প্রতি এই লোক-শিল্পী দল কখনই ছিল না বিমুখ। যে বিজ্ঞান জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির যে বিশেষ দিকের প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের জীবনে তাকেও লোক-শিল্পীগণ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। এই অগ্রগতির কখনও প্রশংসা করেছেন কখনও বা কেবল অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছেন এই অগ্রগতিতে।

জন-মানসের বিস্তৃত পটে এই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রভাব কতটা সুফল এনেছে সে সম্পর্কে যেমন এঁকেছে সুন্দর চিত্রপট, তেমনি প্রয়োজনে এর কুফল নিয়েও আলোচনা রয়েছে লোকসঙ্গীতগুলিতে।

গ্রামের মানুষের সাধারণতঃ যাতায়াতের ব্যবস্থায় ছিল পদব্রজ এবং গরু বা মোষের গাড়ী। এরপর আবিষ্কার হল সাইকেল এবং ক্রমে ক্রমে তা সর্বব্যাপী হয়ে গ্রামেও পৌঁছে গেল এক সময়। এই সাইকেল সম্বন্ধে লোক-কবিদের চিন্তা ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে লোকসঙ্গীতে।

শব্দার্থ : ১-গোলামখানা বা চাকুরীর জায়গা, ২-ভয় পেয়ে, ৩-গোরা বা ইংরেজ মালিক।

(১১০)

হ্যাক ভাই কলিকালে।
সাইকোলের কি সন্মান, হ্যাক ভাই কলিকালে॥
যত ভদ্দরনোক[১] সাইকোলেতে চড়ে, ভ্যাক্[২] হ্যাকিয়া ঘাড়োত তোলে
দুই হাতে হ্যাণ্ডোল ধইরে ঝম্প দিয়া সাইকোলেতে চড়ে
দুই পায়ে প্যাডেল করে, চাপিয়া হ্যাণ্ডোল ধরে॥
সাইকোল আইল মুচির ঘরে, চামের[৩] বোঝা সাইকোলেতে তোলে
বাবুর ব্যাটা সাজ ধরে, হ্যাক ভাই কলিকালে।
যারা ভদ্দরনোক শহরোৎ[৪] থাকে, সাইকোল তারা ভালয় না বাসে[৫]
হাটিয়া চলে, বাতের বিষ গায়ে ধরে, হ্যাক ভাই কলিকালে।

সাইকেল চালানোর কায়দাও জানেন লোককবিরা, তাঁরা তাই কি ভাবে সাইকেল চালাতে হয় সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেন।

(১১১)

মন যদি চড়বিরে সাইকেল।
আগে দে কপনী এঁটে, অকপটে সাচ্চা কর দেল[৬]॥
ফুট পিনে দিয়ে পা, হপিং করে এগিয়ে যা
পিনের পরে উঠে দাঁড়া, বেদ বিধি হবি ছাড়া।
সামনে কর নজর কড়া
আগাগোড়া ঠিক রাখিস হ্যাণ্ডেল॥

বিজ্ঞানের অগ্রগতির আর এক দিক অ্যারোপ্লেন আবিষ্কার। এই অ্যারোপ্লেন গ্রামের মানুষ প্রথম যখন দেখে তখন সকলেই অবাক হয়ে যায়। এর কলাকৌশল নিয়ে তাই জনমনে জাগে নানা কল্পনা। লোককবিও পিছিয়ে নেই এই উৎসাহ থেকে, এই অ্যারোপ্লেন নিয়ে তাই তাঁরাও গান বেঁধেছেন আপন সুরে। বরিশালের 'বয়াতী'র গানের শিল্পীর কণ্ঠে অ্যারোপ্লেন নিয়ে নানা খবর পৌঁছে যায় জনগণের কাছে।

শব্দার্থ: ১-ভদ্রলোক, ২-কাদা, ৩-চামড়া, ৪-শহরে, ৫-ভাল বাসে না, ৬-দিল বা মন স্থির কর।

(১১২)

আমি দ্যাকলাম ভাইরে গগন ভইরে
উড়্যা চইল্যা যাইতেছে এরোপেলেন।
ও তার দুই ধারে পাংখা দিয়া
কইর‍্যাছে বেশ গঠন।
গলই-খোপেতে[১] বসা সারেং[২] একজন
ও তারা বিনা তারে কল চালায়, ইচ্ছামত উড়্যা যায়
এই যে মিনিটেতে পার হয়্যা যায় নয়টি এস্টেশন[৩] ॥
এই যে সাত এস্টেশন কইরে, ভেরমন[৪] হইছে মণিপুরে
দুই এস্টেশন বাবু চেনেন ক্যামন কইরে।
এই যে এরোপেলেনের গলই-খোপে
বাবু দুইডা কলের টসলাইট[৫] দ্যাকতে পাই
ও তারা আলো জ্বালাইয়ে যাচ্ছে চলিয়ে ॥
গমনে তার বাধা নাই
কেবা ব্যাটারী দ্যায় তাহা আমি শোনতে চাই
ও তুমি বস দ্যাকি বয়াতী ভাই, জানা যদি থাকে তাই
এই যে অন্ধকারে ঘুইরে এরোপেলেন কোন ঘাটে ভিড়ায়[৬] ॥

১৯৩১ সনের (বাংলা ১৩৩৮ সালে) কোনও একদিন রংপুরবাসীর চোখে প্রথম অ্যারোপ্লেন ধরা পড়ে। সকলে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, স্বর্গের দেবতার রথ মনে করে অনেকে একে প্রণামও করে। লোক-কবিরা এই ঘটনা তাঁদের গানের ঝুলিতে ভরে রেখেছেন।

(১১৩)

সন তেরশো আটত্রিশ সালে
একি হইল অবোতার[৭]
হায় হায় একি হইল অবোতার।
উড়ুজাহাজ চলিয়া আইলো
অংপুরা[৮] জেলার মাঝার।
একি হইল অবোতার ॥

শব্দার্থ : ১-কক্‌পিট (অ্যারোপ্লেনের সামনে যন্ত্রপাতির অংশ ও চালকের আসন), ২-পাইলট বা চালক, ৩-ষ্টেশন, ৪-ভ্রমণ, ৫-প্লেনের পিছনের লাল আলো, ৬-অন্ধকারে কিভাবে প্লেন নামায়, ৭-অবতার অর্থাৎ দেবতার অংশ, ৮-রংপুর।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির অন্যতম অবদান টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কার, ও দ্রুত সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা। অবাক বিস্ময় জাগে জনগণের মনে, লোক-কবিও অবাক হয়ে যান ইংরেজের এই কলা-কৌশলে। গণচেতনার অঙ্গ হিসাবে লোকসঙ্গীতের দ্বারা জনগণকে ওয়াকিবহাল করেন বিজ্ঞানের এই নবতম অবদান সম্পর্কে।

(১১৪)

দ্যাকরে ইংরেজ লোকে কি কল কইর‍্যাছে।
সাত সাগর পাড়ি দিয়া রাইজ্য পাইত্যাছে।
জঙ্গল কাইট্যা সড়ক বানাইছে—
সেই সড়কে তার বসাইছে
দিনের খপর ঘড়িতে[1] আইন্যাছে॥

১৬৫৭ সাল থেকেই মূলতঃ আবিষ্কারের যুগ শুরু। ইংরেজ বিজ্ঞানীরা এই সময়ে নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ১৭৫৭ সাল থেকে ভারতে বৃটিশ আধিপত্য শুরু হওয়ার সময় থেকেই ভারতেও এই সব আবিষ্কারের ফল প্রকাশ পেতে থাকে। এইসব আবিষ্কারের প্রভাব সাধারণ মানুষের মনেও পড়তে থাকে, কারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এদের প্রভাবও কম নয়। ১৮৬২ সালে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেললাইন পাতলে রেলগাড়ী দেখে সকলে অবাক হয়ে যায়। যদিও এর আগে ভারতে রেললাইন বসেছে তৎকালীন বোম্বাইতে। এই রেলগাড়ী নিয়েও লোকসঙ্গীত রচিত হয়েছে, অবাক বিস্ময়ে লোকশিল্পী গেয়েছেন, যদিও গূঢ় অর্থে এই গাড়ী জীবন-গাড়ী।—তারই কলা-কৌশলের সঙ্গে রেলগাড়ীর সাযুজ্য টানা হয়েছে অতি চমৎকার ভাবে।

(১১৫)

গাড়ী চলছে আজব কলে
গাড়ীতে দিয়ে মাটি পরিপাটি
আগুন জল আর হাওয়ার বলে[2]॥

শব্দার্থ : ১-যে খবর আনতে অনেক দিন লাগতো টেলিগ্রাফের ফলে সেই খবর কয়েক মিনিটে চলে আসছে, ২-স্টীমের জোরে রেল ইঞ্জিনের চলার কথা বলা হয়েছে।

ইঞ্জিনের কলের ভিতর মরি কি আজব লহর
কি চমৎকার নীলে বালাখানায় জ্বলছে বাতি।
আলো কইরছে রংমহলে॥

১৯১৫ সালে পদ্মা নদীর উপর স্থাপিত কুষ্টিয়া-পাবনা জেলা সংযোগকারী হার্ডিঞ্জ সেতু দেখে জনগণের কৌতুহলের সীমা থাকে না। লোকসাংবাদিকতায় এই সেতু এক অসাধারণ খবরের মর্যাদা পায়। এই খবরের সঙ্গে সঙ্গে সেতু তৈরীর সময়ের কিছু গোপন খবরও প্রকাশ পায়। লোক-কবিরা এই তথ্যও পরিবেশন করেন তাঁদের গানের মধ্যে।

(১১৬)

পদ্মানদীর পুল বেঁধেছে ভাল।
কত ইট পাটকেল থাপড়া[১] কুচি পদ্মার কুলে দিল।
কত জায়গার মানুষ ঐ জাঙ্গা[২]তে মল॥
পুলের থাম্বা[৩] ষোল জোড়া
উপরে তার গিল্‌টি করা
কাঁকড়া-কলে[৪] মাটি তুলে থাম্বা বসাইল॥
মেম সাহেবের বুদ্ধি খাসা, পুল বেঁধেছে বড় খাসা
ষোল জোড়া থাম[৫] বসাতে, তিনজন সাহেব ম'ল॥
চোদ্দশ কুলির মধ্যে নয়শো কুলি ম'ল
পুলের খরচ মোটামুটি টাকার খরচ সাত কুটি[৬]
আমার খ্যাপা চাঁদের কি কারখানা বুঝতে জনম গেল॥

বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেমন কিছু মানুষের উপকার করেছে, তেমনি আবার গ্রামীন জীবনে কয়েক শ্রেণীর লোকের পক্ষে তা অভিশাপ হয়েও দাঁড়িয়েছে। ধান-ভানা কলের প্রচলন হলে গ্রামীন জীবনে এক বিপর্যয় নেমে আসে বিশেষত যারা ঢেঁকিতে ধান ভেনে সংসার চালায়। এই ধান ভানার কাজ ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় যারা এর উপর নির্ভরশীল ছিল তাদের অন্ন সংস্থান দুরুহ

শব্দার্থ : ১-পাথর কুচি, ২-বাঁধে, ৩-থাম বা 'পিলার', ৪-ড্রেজার (মাটি খোঁড়ার যন্ত্র), ৫-থাম বা 'পিলার', ৬-সাত কোটি।

হয়ে দাঁড়ায়। তবু লোকের মনে কৌতূহল, কি ভাবে এই ধান ভানা কল কাজ করে চলেছে। ঢেঁকির চেয়ে অনেক বেশী দ্রুত গতিতে এবং মাত্র একজন লোকের সাহায্যে কতজনের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। লোকসাংবাদিকের ভূমিকায় রত লোককবিও এই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, আর যারা ধান ভেনে জীবিকা-নির্বাহ করে তাদের কষ্টের কথাও প্রকাশ করেছেন লোকসঙ্গীতে।

(১১৭)

ভোট পাটিতে বসিসে[১] মিসিন[২] চল দ্যাকিবারে যাই
শুন মোর ওহো গে আই।
ইংগিরাজের[৩] বুদ্ধি ভারী আনিসে ধানভুকা[৪] কল
অ্যাকদিকে ওটচে ধোয়া অ্যাকদিকে পড়সে জল
অ্যাকদিকে পড়সে ভূষি অ্যাকদিকে পড়সে চাইল[৫] ॥
খাজনার আলে ধনীগিলা[৬] আরো বেচাছে ধান
আপনারে গাড়ী গরাই মিসিন ন্যাকিয়া ঘ্যাচে ধান।
ধান ব্যাচেয়া ধনীগিলা হাউসে[৭] মোটকটোক্[৮]
কত ধনী চাইল কিনিসে বাজার হাটোত্।
ধানের দর হইল আষ্ট আনা চাইল চাইর পাইসা
ওই দাদে ভুকাতি গিলা[৯] হারাইসে দিশা[১০]
শুন মোর ওহো গে আই ॥

ঠ. রাষ্ট্রীয় রাজনীতি সম্পর্কিত গান

রাষ্ট্রীয় রাজনীতির কূট-চালে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে শুরু হয় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ (Direct action), ফলে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর এই অজুহাতে তৎকালীন বৃটিশ সরকার ভারত-ভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে দুটি রাষ্ট্র গঠন করলেন ভারত আর পাকিস্তান।

শব্দার্থ—১-বসেছে, ২-মেশিন, ৩-ইংরাজের, ৪-ধান ভানা, ৫-চাউল, ৬-ধনী ব্যক্তিরা, ৭-আনন্দে, ৮-ডগমগ, ৯-যারা ধান ভেনে জীবিকা নির্বাহ করে, ১০-দিশাহারা হয়েছে।

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার, দলে দলে হিন্দু দেশ ত্যাগ করে পাড়ি জমায় ভারতের মাটিতে।

বিচ্ছিন্ন হিন্দুদের এক জোট হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মোকাবিলা করার জন্য পল্লী কবিরা আহ্বান জানালেও প্রাণের ও মানের ভয়ে দলে দলে হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করে আসতে থাকে। দেশের এই অবস্থার সম্যক চিত্র ধরা পড়ে যতীন দাসের গাওয়া এমনি একটি লোকসঙ্গীতে।

(১১৮)

আর রইল না মান, গেল মানীর মান
পান যদি ত্রাণ এখন এক হন সকলে।
হিন্দু হয়ে হিন্দু জাতির নিন্দা ছাড়ুন সম্প্রতি
নচেৎ দেখুন হবে ইতি সব আশা যাবে বিফলে॥
যত ছিল আশা ভরসা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সবই নিরাশা
এখন লোকের দিশা বিশা হারা হইল ভাই কর্মফলে।
বহুদিনের মাতৃবলে ভারতবাসীর চাপা কলে
সাদা ইঁদুর[১] দলে দলে ঠাণ্ডা হয়ে যান চলে॥
তাদের ছিল চক্ষু হল অন্ধ শেষে করে চক্রান্ত
ভাইয়ে ভাইয়ে লাগল দ্বন্দ্ব সর্বক্ষেত্রে দেখা গেল।
শেষে সোনার করল শ্মশান হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান
শেষে করে যাই এই বিধান তাও বুঝি আজ যায় বিফলে॥
অধম যতীন বলে বিনয় করে বন্দেমাতরম ধ্বনি করে
জেগে উঠুন ভাই হুহুঙ্কারে নেমে আসুন দলে দলে॥

কিন্তু এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জন্মভূমিতে একসঙ্গে থাকার সাহস আর কেউ সঞ্চয় করতে পারল না, ফলে বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। ভিটেমাটি ত্যাগ করে স্বাধীন ভারতে যারা আশ্রয় নিলেন তাঁদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ল। উদ্বাস্তু শিবিরে কি ভাবে তাঁদের দিনাতিপাত হত, তারই এক করুণ ছবি এঁকেছেন জনৈক লোক-কবি—

শব্দার্থ : ১-সাদা ইঁদুর অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি।

(১১৯)

ছ্যাশে বসতি নাইরে শোন শোন ভাই
বিধাতার (অভিশাপে) কোপে হেথায় নাই মোর ঠাঁই ॥
নিজ ছ্যাশে আমরা আজি হইলাম পরবাসী।
বৃথায় গেল শীতলক্ষ্যা গয়া গঙ্গা কাশী ॥
বড় আশায় বুক বান্দিলাম সাগরে ঝম্প দিয়া
দারুণ বিধির ফ্যারে[1] বজ্জর[2] পড়ে ভাঙ্গিয়া।
বাস্তুত্যাগীর মরম কথা শোন্‌লে প্রাণে লাগে ব্যথা
তারা সোনা ফেইল্যা পেতল নিয়া উজানে ছ্যায় সাঁতার ॥
রিলিপ মাষ্টার অপিচার[3] হয়
কথায় কথায় মুখ-ঝামটা ছ্যায়
কানে ধইর‍্যা করে অপমান।
হায় কি সুখে বসতি করি শোন শোন ভাই ॥
ছিল দালান কোঠা ঘর দরোজা পুকুর দিঘি ফুল বাগিচা
হারে পদ্মা ম্যাগনা[4] পর হইল ছাড়লাম জনমভূমি
বিধি কি সুখে বসতি করি ॥

দেশ ভাগের পর দলে দলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ভারতে চলে এলে বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ও তাদেরই আজন্ম প্রতিবেশীর শোকে হাহাকারে কেঁদে ওঠে। শ্মশানের চেহারা নেয় পূর্ববঙ্গ, এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গের পল্লী কবিরাও আক্ষেপ করেন গানের সুরে—

(১২০)

ভাইরে পূর্ববঙ্গ হইলরে শ্মশান।
যত ধনী মানী অভিমানে, সকল গেল হিন্দুস্থান।
লক্ষ্মী সরস্বতী গেল চলে
আমরা রইব কাদের বলে
না জানি কি আছে ভালে নাইকো নিরূপণ ॥

শব্দার্থ: ১-বিধাতার কোপে, ২-বজ্র, ৩-অফিসার, ৪-মেঘনা নদী।

যখন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ জাগবে মনে
কাঁদবে বসে হিন্দুস্থানে
ভাইরে পূর্ববঙ্গ হলরে শ্মশান ॥

একদিকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা যেমন শোকাহত দেশ ভাগের ফলে, ভারতেও তখন এই ভাগাভাগির পরিণতিতে আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে। মালদহের লোককবি গম্ভীরার মধ্যে সেই অশনি সঙ্কেতের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

(১২১)

বাপরে বাপ জান বাচান হল দায়।
শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, নলখাগড়ার প্রাণ যায় ॥
ধন্য বৃটিশরাজের চাল ওযে করলে নাজেহাল
শ্যাষে মাথার ঘায়ে পাগল হয়্যা
উড়োজাহাজে হাওয়া খায় ॥
চার্চিল ছদ্মেরই বেশে, অট্টালিকাতে বসে
চপ কাটলেট চুষে অ্যাটলিরে কেটলি বানায়া
সেই জলেতে চা খায়।

কেবল বৃটিশ সরকারের কূটনীতির সমালোচনাই নয়, স্বদেশের নানা রাজনৈতিক নেতাদেরও দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিয়েছেন লোক-গীতির এই সব শিল্পীবৃন্দ। দেশ নেতাদের স্বার্থপরতার ফলে সাধারণ মানুষের যে দুর্ভোগ তার জন্য প্রকৃত দোষীদের দিকে আঙ্গুল তুলে গম্ভীরার শিল্পীরা গেয়েছেন—

(১২২)

দ্যাশের কত যে ন্যাতা[১] তাদের বড় বড় কতা[২]
পায়া[৩] স্বাধীনতা লাড্ডু কোঠে হয়া গেল গাড্ডু[৪]।
দেইখ্যা তাদের স্বার্থপরতা খাল্যে হামাদের মাতা[৫]
শ্যাষে ঘরে আগুন লাগেয়া[৬] দিয়া
সোনার ভারত করলো খান, হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান ॥

শব্দার্থ : ১-নেতা, ২-কথা, ৩-পেয়ে, ৪-অদৃশ্য হয়ে গেল, ৫-মাথা, ৬-লাগিয়ে।

দেশ ভাগের ফলে নিজস্ব ঘরবাড়ী জমি জায়গা ফেলে ভারতে উদ্বাস্তুর খাতায় নাম লিখিয়ে কিভাবে জীবন-যাপন করতে হয়েছে তারও কাহিনী শোনা যায় লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের গানে। আয়ের কোন সংস্থান নেই, নেই অন্নবস্ত্রের যথাযথ সংস্থান, এ অবস্থায় কিভাবে দিন কাটে এই উদ্বাস্তুদের তারই জীবন-কাহিনী এই রচনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

(১২৩)

কই তরা আজ হ্যাশ হিতৈষী ও দরদী ভাই ভগিনী
মাঝে মাঝে চমকে উঠি যেন 'নারায়ে তগ্‌দির'[১] শব্দ শুনি।
মোদের মায়ায় ঘেরা ঘর ছিলরে বুক ভরা খুব আশা
স্বাধীনতার দমকা হাওয়ায় ভাঙ্গলো সুখের বাসা
হয়ে বাস্তুহারা কপাল পুড়্যা রে ভাই
(করি) হ্যাশে হ্যাশে আজ আনি গুণি[২] ॥
পরের ঘরে আর ভিক্ষার চালে
জীবন কি আর ধারণ চলে, মানুষির হালে
তিলের খাজা আর ঘুঘনি দানা রে ভাই
কত করা যায় বিকিকিনি ॥
কোথায় আমি রইলাম পড়ে কোথায় বা বোন ভাই
কত ভিটা উজার হল ল্যাখাজোখা[৩] নাই
এখন বল কোথা যাই কোথায় দাঁড়াই রে ভাই
কই[৪] বান্দি আজ ভিটা খান কই মুছি আজ চোক্ষের পানি ॥

বাস্তুহারার মর্মবেদনার কেবল এই রকম চিত্রই নয়, অন্য চিত্রও রয়েছে, যে সামান্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হত তারও সবটা পৌঁছাত না উদ্বাস্তুদের কাছে। এখান থেকেও দুর্নীতি-পরায়ণ কর্মচারীরা আপন স্বার্থ সিদ্ধি করেছে। তারই এক অকথিত কাহিনী শোনা যায় নিবারণ চক্রবর্তীর গানে—

শব্দার্থ: ১-'ইসলাম সঙ্কটে' অর্থাৎ মুসলমানদের আক্রমণাত্মক ধ্বনি, ২-আনাগোনা করি, ৩-হিসেব নিকেশ, ৪-কোথায়।

(১২৪)

ছিল বুক ভরা আশা
স্বাধীনতার দমকা হাওয়ায় ভাঙলো সুখের বাসা।
কইলে বহু কথা মনের ব্যথা কইবার জায়গা নাই
হইল বাস্তুহারার ধনে রাজা বাস্তুঘুঘুর ভাই।
কথা সইত্য কিনা আজও পাইনা মাথা গুঁজবার ঠাঁই
আবার সরকারী সাহায্য পাইল পাইকারের জামাই॥

দেশভাগের পর দলে দলে হিন্দুদের ভারতে চলে আসায় পূর্ববঙ্গের লোককবিরাও ব্যথিত ; অবাক বিস্ময়ে তারা এই অবস্থার বিশ্লেষণ করে। একই সঙ্গে এতকাল যারা পাশাপাশি বাস করেছে তাদেরই আজ দেশ-ত্যাগ করে যাওয়ার ঘটনায় বিস্মিত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের এই সব লোককবিরা গায় 'জারী' গান—

(১২৫)

স্বাধীন দ্যাশে লোক পলাইল এমন খবর শোনছো নি[১]
বাপ দাদার ওই ভিট্যা ছাইড়্যা[২] চইলছে সব বিদ্যাশে কি ?
হিন্দু মোছলমান একই জাত ভাই একই দ্যাহের[৩] দুইডা হাত
কেউ কারও নয় শত্তুরে ভাই দুইয়ে দুইয়ের মিত্তির হয়॥
রোজ সকালে আজান গান বেরাম্মনের[৪] মোন্তর পাট[৫]
সন্ধ্যাকালে নেমাজ পড়ে কুলনারী পির্দিম দ্যায়[৬]
এক সাথেতে রইছি মোরা এক সাথেতে করছি খ্যালা
একই সঙ্গে চলছি ফিরছি এখন ক্যানে ভিন্ন ভাব ?
ও ভাই পরের কথায় পরের ভরসায়
ছাইড়ো না দ্যাশ মাথা খাও॥

রাষ্ট্রীয় রাজনীতির আর এক দিক নির্বাচন। ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে যে গণ-নির্বাচন হয়, সেখানেও লোককবিরা সমাজের

শব্দার্থ : ১-শুনেছো নাকি ?, ২-ছেড়ে, ৩-দেহের, ৪-ব্রাহ্মণের, ৫-মন্ত্রপাঠ, ৬-প্রদীপ দেয়।

মেকী দেশ-দরদীদের সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দিয়েছেন। পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ছড়িয়েও এই সব ভুয়া দেশ-দরদী জনগণের কাছে ভোটের জন্য ধরণা দিয়েছিল, তাদেরই স্বরূপ উন্মোচন করেছেন উত্তরবঙ্গের উদ্বাস্তু কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত।

(১২৬)

তোমরা এবার লও চিনিয়া তোমরা এবার লও চিনিয়া
আসছে কত খ্যাশ দরদী ভোটাভুটির গন্ধ পাইয়া।
শুনতে পাই হাটবাজারে এবার যত জমিদারে
ট্যাহা পয়সা খরচ করে ভোট নিবেন কিনিয়া।
খদ্দর টুপি ধরেছেন কেহ কোলাব্বর ছাড়িয়া
যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করেন কেমন আছেন সেলাম দিয়া॥
কেউ কেউ লীগের নাম ধরে বলছেন লম্বা উয়াজ পড়ে
এবার ভোট দাও আমারে মোছলমান বলিয়া
আমি আছি লীগের মেম্বার সাত বছ্ছর[১] ধরিয়া
এবার ভোট না দিলে হিন্দু যাবে স্বরাজ লইয়া॥
ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগে পিঠা যায় বানরের ভাগে
এই কথাডা বহু আগে গেছে পষ্ট হইয়া।
কত মামু আইতাছেন খ্যাশ দরদী সাজিয়া
কোন বেহেস্তে[২] লইবেন তারা লালু-কালুর[৩] ভোটখান নিয়া।

নির্বাচনের দিন ধার্য হলেই রাজনৈতিক নেতাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত দেশনেতারা তখন চলে যান এইসব ভুয়া দেশবাসীর হাঁকডাকের আড়ালে। তথাকথিত দেশ-নেতারা বাজার করেন মাৎ। নানারকম প্রলোভন আর খাতির-যত্নে নির্বাচকদের খোশামুদি শুরু হয়ে যায়। নির্বাচনের সময় এইসব ভেকধারী দেশনেতাদের প্রকৃত রূপ তুলে ধরেন লোকসাংবাদিকেরাই। পার্থিব সবকিছুর প্রতি বিমুখ হয়েও এইসব লোক-কবি সমাজের বিভিন্ন দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। জনগণকে জনচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন, ভাল-মন্দের বিচার

শব্দার্থ: ১-বছর, ২ স্বর্গে, ৩-সাধারণ লোকের।

করার দৃষ্টি খুলে দেন। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানে এই ভুয়া দেশ-দরদীর সন্ধান পাওয়া যায়, নির্বাচনের প্রাক্কালে।

(১২৭)

কতয়[১] দেকিম ভাই ভোটের ভেকধারী
কাঙ্গালের বন্ধু সাজি বেড়াচে টারিটারি[২]।
ন্যাতালা[৩] ভোটের বাদে হোইসে বাহির ॥
বুড়া ন্যাতালা কহেসেন নয়া নয়া বুলি
বেড়াচে ঘাড়ে নিয়া ভোট ভিক্কার ঝুলি
জীবিহাতে[৪] নিকালিয়া দ্যাচে পান বিড়ি
হবার চাছে হামার মেম্বার মোন্তিরি[৫] ॥
ভোট পালেরে[৬] ভাই দেকায় হওয়া দায়
এলায় তো বন্ধুর নেকায় জোকায়[৭] নাই ॥

নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়লে দেশ নেতাদের মধ্যে কি রকম তৎপরতা বেড়ে যায় তারই এক সুন্দর চিত্র ফুটিয়েছেন উত্তরবঙ্গের চট্‌কা গানের শিল্পী। দেশের জনগণকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এইসব গানে, যাতে দেশবাসীর চিন্তায় সঠিক ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ার বাসনা জন্মায়। অন্যথায় ভেকধারী দেশ-নেতাকে ভোট দিলে আখেরে লোকসান হবে জনসাধারণেরই।

(১২৮)

উত্তরবঙ্গের কিষাণ সাবধান
যদি মানষির মতো বাঁইচবার চান।
ভোট নিবার বাদে[৮] দ্যাশে নাগিছে ঢেউ
চোঙা ফুকে কেউ নম্ফ ঝম্ফ করে কেউ।
ন্যাতালা বান্দি নানান পার্টি
ভোটের তনে কইরচেন উজান-ভাটি[৯]।

শব্দার্থ: ১-কত, ২-বাড়ীবাড়ী, ৩ নেতারা, ৪-প্যাকেট থেকে, ৫-মন্ত্রী, ৬-ভোট পেলে, ৭-লেখা জোখা অর্থাৎ অগুনতি, ৮-ভোট নেওয়ার জন্য, ৯-সব জায়গায় যাচ্ছেন।

হ্যাশে নাগিচে ভোটের মস্ত বড়ো ঢেউ
বড় বড় ন্যাতাগিলার না হয় ঘুম।
নানান দল বান্দি করে দলাদলি
কাঁহো ডাইনে কাঁহো বাঁয়ে যায় চলি॥

কিন্তু কেবল জনগণকে ভুয়া দেশ নেতাদের সম্পর্কে সাবধান করেই ক্ষান্ত হননি লোককবিরা, প্রয়োজনে এঁরা সরাসরি তাঁদের বক্তব্যও পেশ করেন। দেশ-দরদী সেজে যারা নির্বাচনের প্রাক্কালে দোরে দোরে ঘোরে ভোটের আশায়, তাদের স্বরূপ চিনতে বাকী থাকে না জনগণের। লোককবিরাও জনগণের মনের কথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেয় এইসব ভোট-ভিক্ষাকারী জননেতাকে। জলপাইগুড়ি জেলার 'গম্ভীরা' গানে এমনিই এক স্পষ্ট ভাষণ শোনা যায় জনৈক পল্লীকবির গানে।

(১২৯)

হামার কাথা শুনহে তমরা[১]
চাষী মানষি ল্যাখাপড়া নাই শিখি
তোমরা হল্যা[২] শহর কইলকাত্তাবাসী।
হামরা হল্যাম চাষী মানষি
যেই বুল্যাইচ[৩] সেই বুল্যাচি
আইস্যাছে ভোটের পালা
খায়ায়া[৪] দিম্ আটিয়া কালা[৫]॥

নির্বাচনের জয় পরাজয়ের খবরেও লোককবিরা মুখ ফিরিয়ে থাকেন না; এক দলের পরাজয়ে অন্য দলের উল্লাস দেখে এই সব লোকশিল্পীও অবাক হয়ে যান। ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস সরকারের পতনের ফলে জনতা সরকার স্থাপিত হয় কেন্দ্রে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে লোককবি নিবারণ পণ্ডিত রচনা করেছেন এই গান। সংবাদপত্রের নির্বাচনোত্তর সমীক্ষারই অনুরূপ এই লোক-সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত সঙ্গীত।

শব্দার্থ: ১-তোমরা, ২-হচ্ছো, ৩-যা বলিয়েছো, ৪-খাইযে দেব, ৫-বিচি কলা।

(১৩০)

বলি হোল কিরে হোল কি ?
দেশ জুড়ে লেগেছে এক রাম ঝাঁকি ॥
দেশে হাওয়া উল্টা বয় কথা সবই উল্টা কয়
কেউ দিতেছে উল্টা করে আপন পরিচয়।
আবার কেউবা আপন ঘর খুঁজিছে
দেশের উল্টা ভাব দেখি রে॥
কারও ভাঙলো মনের জোর কারও দুখের রাত্রি ভোর
কেউবা দেখি মন উল্লাসে হয়েছে বিভোর।
আবার কেউ খেলতে চায় লুকোচুরি
মুখে মধুর ভাব রাখিয়ে ॥

ঙ. সমকালীন ঘটনাবলীর গান

সাংবাদপত্রের সাংবাদিকদের যে ভূমিকা, লোক-সাংবাদিকদের ভূমিকাও অনুরূপ। লোকসঙ্গীত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বিকশিত হলেও রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ লোক-সাংবাদিক তথা লোককবিদের দৃষ্টি এড়ায় না। একক কণ্ঠ হলেও আন্তর্জাতিক ঘটনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে লোককবিও সোচ্চারে প্রতিবাদ জানান আগ্রাসী রাজনীতিকে, অভিযোগের আঙ্গুল তুলে ধরেন দোষী রাষ্ট্রনায়কদের দিকে। আন্তর্জাতিক এমনি এক ঘটনা হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া দখল আর জাপানের চীন সীমান্তে আগ্রাসন।

১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কুখ্যাত 'মিউনিখ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। নাৎসী বাহিনীর বর্বরতা ও হিটলারের আগ্রাসী নীতি বিশ্বকে স্তম্ভিত করে, কিন্তু তার এই জঘন্য অত্যাচারের প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না অন্য কোন রাষ্ট্রনায়কের তবু এই ঘটনায় ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছিল গ্রামবাংলার এক লোক-কবির একক কণ্ঠে। আর প্রতিবাদ ধ্বনিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্নিবর্ষী লেখনীতে, তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায়। জাপানের দ্বারা চীন আক্রমণে ব্যথিত কবি লিখলেন—

'মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে।
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী
শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিৎ বীভৎসা পরে
ধিক্কার হানিতে পারি যেন।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার পাশাপাশি লোককবি নিবারণ পণ্ডিত তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে প্রকাশ করলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বর্বরতার ইতিহাসের কুৎসিত রূপ। ইংরেজ ও ফরাসীদের 'মিউনিখ চুক্তি' স্বাক্ষরের ফলে একদিকে হিটলার যেমন দখল করলেন চেকোশ্লোভাকিয়া তেমনি জাপান আক্রমণ চালায় চীনের উপর। বিশ্বের রাজনীতিতে নির্লজ্জ আক্রমণের ইতিহাস প্রচারিত হল লোককবির গানে।

(১৩১)

শুনেন সবিশেষ একটি দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া যার নাম
ছিল রাষ্ট্রমধ্যে উন্নত সে বড়ই সুঠাম
এডওয়ার্ড বেন্‌স।
এডওয়ার্ড বেন্‌স কর্তৃত্বের পুরোভাগে থেকে
সুন্দর এক রাষ্ট্ররূপে গড়েছিল তাকে, সুখ শান্তি ছিল।
সুখ শান্তি ছিল, বাদ সাধিল প্রদেশ সুদাতেন
সুদাতেনে জার্মান কিছু বাস করিতেন, তারা সংখ্যালঘু।
তারা সংখ্যালঘু, হয়েও তবু হিটলারের প্ররোচনায়
সুদাতেনের স্বায়ত্ত শাসন দাবি অকস্মাৎ উঠায়।
দাবি জোরদার ওঠে।
দাবি জোরদার ওঠে, মাঠে ঘাটে চলে আন্দোলন
গুণ্ডামি ভণ্ডামি কত হিংস্র উৎপীড়ন। চলে বিশৃঙ্খলা।
চলে বিশৃঙ্খলা, ছলাকলা দেশের অভ্যন্তরে
পশ্চাতে থাকিয়া হিটলার কলকাঠি নাড়ে। তখন চেক সরকার।

তখন চেক সরকার, দৃঢ়তার সাথে বাধা দেন
শান্ত করিতে চাইলেন প্রদেশ সুদাতেন। উৎপাত বেড়ে গেল।

উৎপাত বেড়ে গেল, জোর চলিল নাৎসী-জ্বালাতন
বেন্‌সের ভাবনা এই অবস্থায় কি করিব এখন। দেখি জিজ্ঞাসা করে।
দেখি জিজ্ঞাসা করে, ইঙ্গ ফ্রান্সদের তারা কিবা বলে
নাৎসী উৎপাত বন্ধ করব ওদের ভরসা পেলে। ইহা সহ্য হয় না।

ইহা সহ্য হয় না, অন্যায় বায়না ওরা যাহা চায়
চেক রাষ্ট্রে জার্মান কেন অশান্তি বাড়ায়। শুনে ইঙ্গ ফ্রান্স কয়।
শুনে ইঙ্গ ফ্রান্স কয়, দ্বন্দ্ব নয় হিটলারের সাথে
মিটমাট একটা করাই ভাল আমাদের মতে। সুদাতেন দিয়ে দাও।

সুদাতেন দিয়ে দাও, মেনে নাও স্বায়ত্ত শাসন
হিটলার সাথে থাকবে না আর দ্বন্দ্বের কারণ। দাবি মানা হোল।
দাবি মানা হোল, কয়দিন গেল শুনেন তার পরে
গোটা চেক রাজ্যটি হঠাৎ হিটলার দাবী করে। ওটা আমার চাই।

ওটা আমার চাই, যদি পাই আর বারেবার
ইউরোপে রাষ্ট্রীয় দাবী থাকবে না আমার। কোন কথা থাকলে।
কোন কথা থাকলে, সবাই মিলে চলুক আলোচনা
চেক রাষ্ট্রটি না পেলে মোদের দাবী মিটবে না। শুনে মিস্টার চেম্বারলেন।
শুনে মিস্টার চেম্বারলেন, ছুটে গেলেন হিটলারের কাছে
কানে কানে বললেন এতে আমার মত আছে। চেককে বাদ রেখে।
চেককে বাদ রেখে, মিউনিখে এক চুক্তিপত্র হলো
ইঙ্গ-ফ্রান্স মিউনিখ চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ১৯৩৮ সন।

১৯৩৮ সন, ইঙ্গ-ফ্রান্সগণ ২৯শে সেপ্টেম্বর
কুখ্যাত ওই মিউনিখ চুক্তি করিলেন স্বাক্ষর। খবর ছড়াইল।
খবর ছড়াইল, সংবাদ এলো কবির গোচর
স্তম্ভিত হইলেন কবি দুঃখিত অন্তর। কবি বার্তা পাঠান।

কবি বার্তা পাঠান, বেদনা জানান এড্‌ওয়ার্ড বেনসের নামে
১৯৩৮ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর একটি টেলিগ্রামে। ইহার সাথে সাথে।

ইহার সাথে সাথে, বেদনাতে কাঁদে কবি-চিত্ত
রচিলেন কবিতা এক নাম 'প্রায়শ্চিত্ত'। অধ্যাপক লেনসির কাছে।

অধ্যাপক লেনসির কাছে, দিলেন পৌঁছে বেদনার্ত হইয়া
ফ্রান্স ব্রিটেনের বেইমানির পূর্ণ আখ্যা দিয়া। ঐ সেদিন হতে।
ঐ সেদিন হতে, পৃথিবীতে প্রকাশিল সত্য—
ফ্যাসি বিরোধী বিশ্বকবি ক্ষুব্ধ বেদনার্ত। এবার পূবে চলুন।

এবার পূবে চলুন, একটু শুনুন জাপানী কথন।
কবির প্রতি জাপানীদের কিরূপ আচরণ। বিপুল সৈন্য নিয়া।
বিপুল সৈন্য নিয়া, হিটলার গিয়া চেকে মার্চ করে
জাপানীরা ঝাঁপাইয়া পড়ে চীনের উপরে। ২১শে অক্টোবরে।

২১শে অক্টোবরে, অস্ত্রের জোরে দুপুর বেলায়
জাপানীরা ক্যান্টন শহরটির পতন ঘটায়। কবি শান্তিনিকেতনে।
কবি শান্তিনিকেতনে, সংবাদ শুনে হলেন বিচলিত
চেকের পর চীনের পতনে হইলেন দুঃখিত। হচ্ছে লোকক্ষয়।

হচ্ছে লোকক্ষয়, যেন প্রলয় পূর্বে ও পশ্চিমে
একি ষড়যন্ত্র চলছে বিশ্বে সভ্যতার নামে। কবি ভাবছেন বসে।
কবি ভাবছেন বসে, হাহুতাশে চিন্তান্বিত মন
হেনকালে জাপান হতে এক আসে আমন্ত্রণ। জাপান যাওয়ার জন্য।

জাপান যাওয়ার জন্য, এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করে
রাসবিহারী বসু লিখছেন যাইতে কবিরে। ইয়েন বিশ হাজার।
ইয়েন বিশ হাজার, উপহার আছে কবির তরে
কবি এলে পাওয়া যাবে তাহারও উপরে। কবি মুচকি হেসে।

কবি মুচকি হেসে, জানান শেষে মানিয়া বিস্ময়
গরীব দেশে জন্ম আমার লোভ করেছি জয়। যারা দুর্বলেরে।
যারা দুর্বলেরে, হত্যা করে করতে চায় বাহার
ধিক ধিক শতধিক কি বলিব আর। আজি এই পর্যন্ত।

আজি এই পর্যন্ত, বলে ক্ষ্যান্ত ছড়া দিলাম ইতি
কবি পদে, সবার পদে জানাই প্রণতি॥

সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধ কয়েক সহস্র স্ত্রীকে করেছে স্বামীহারা, কত মা কে করেছে পুত্রহারা। সম্পদ ও সম্পত্তির কত যে ক্ষতি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই সর্বনেশে বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রভাব পড়েছে তারই চিত্ররূপ ধরা পড়েছে লোককবিদের গানে। কত স্বামীহারা স্ত্রীর কান্না, কত পুত্রহারা পিতা মাতার কান্নার রোল ভেসে উঠেছে লোক সঙ্গীতের এই সব গানে। যুদ্ধের সময় সমস্ত সমর্থ পুরুষদেরই বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছিল, কিন্তু অকালে প্রাণ হারায় অনেকেই। এরই ফলে ঘরে ঘরে ওঠে কান্নার রোল। চট্টগ্রামের একটি গানে ফুটে উঠেছে স্বামীহারা এক স্ত্রীর কান্না।

(১৩২)

বসরার পোষ্টাপিস অইল ছারা।
খসম[১] আমার গেইল গৈ ছাড়ি
লড়াইয়ের ডাক পাই ত্বরা।
দিন গেইল মাসরে গেইল গেইলরে বছর
আইলোনারে খসমের মোর চিডির ওত্তর।
অকালে পড়িল ঠাডার[২] কান্দে ভাইবোন দেশ পারা
হায় হায়রে মাতা কান্দে পিতা কান্দে কান্দে রে সোদর ভাই
বসবার কোন সম্বাদ নাই।
মাইজ্যা[৩] ভাইয়ের বৌএ কান্দে
খুল্ল্যা[৪] ভাইয়ের বৌএ কান্দে
সোয়ামী আমার গেইলরে মারা।
পোলা কান্দে মাইয়া কান্দেরে
বাপজান তারার[৫] গেইল গৈ মারা॥

বিশ্বযুদ্ধকালে যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের অনেকেরই আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। সরকারী মুখপত্রে বলা হয়েছিল নিখোঁজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয় তারা যুদ্ধবন্দী হয়েছিল, না হয় মারা গিয়েছিল যুদ্ধে। স্বামীর সংবাদ না পেয়ে কত রমণী যে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এমনই

শব্দার্থ—১-স্বামী, ২-বাজ (বজ্রপাত), ৩-মেঝো, ৪-খুড়তুতো, ৫-তাদের।

এক করুণ কাহিনী-চিত্র নোয়াখালীর জনৈক রমণীর বয়ানে তুলে ধরেছে লোক কবির দল—বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে যারা নিয়েছিল বিবেকের ভূমিকা। সংবাদপত্রের উপর যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করার বিরুদ্ধে ছিল সরকারী নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু এইসব লোককবিদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞাই কার্যকরী হয়নি, কারণ এইসব সর্বত্যাগী মানুষ কোন নিয়মের বেড়াজালেই নিজেদের আটকা পড়তে দেন নি। তাই সোচ্চারে প্রকাশ করেছেন পল্লীবালার চোখের জলে লেখা কাহিনী জনগণের কাছে, গণচেতনা বৃদ্ধিতে, যাতে যুদ্ধের প্রতি সকলের অনীহা জন্মায়।

(১৩৩)

মোর খসম গেইছে যুদ্ধে চলিয়া
ওগো ননদী আমারে একেলা ঘরে থুইয়া।
ও ননদী গো উড়ুয়াযানে[১] যুদ্ধ করে জাপান আসিয়া
উপরতনে[২] পইড়ল বোমা তুরুম-দারাম[৩] করিয়া॥
ননদী গো পাছোৎ[৪] সিন্নাৎ বাইগোন[৫]
জ্বইল্যা ওঠে চিতের[৬] আগুন
বুজাইলে[৭] মন বুজ মানেনা
ও মনেরে বুজাই আমি কি দিয়া গো ননদী
আমারে একলা ঘরে থুইয়া॥

বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে পৃথিবীর বহু দেশ ও জনপদ। মূলতঃ ভারতের উপর জাপানী আক্রমণই মারাত্মক ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়েছিল। এই আক্রমণ যেমন বিভিন্ন স্থানে হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব যেমন পড়েছে জনমনে তেমনি যুদ্ধে যোগদানের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে সেনা সংগ্রহও করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বা চাঁটগাঁ থেকেও এমনিভাবে প্রচুর সেনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এমনই এক পরিবারের করুণ চিত্র তুলে ধরেছে লোক-কবিরা যা মানুষের মর্মমূলে আঘাত করে। স্বামী-হারা স্ত্রী নানা আশঙ্কায় দিন কাটায় আর আশায় আশায় থাকে কবে তার স্বামী ফিরে আসবে, কিন্তু

শব্দার্থ: ১-উড়োজাহাজে, ২-উপর থেকে, ৩-হুড়মুড়, ৪-পিছনে, ৫-কালো, কচি-কচি বেগুন, ৬-মনের, ৭-বুঝালে।

যুদ্ধের সময় চিঠিপত্রও আসেনা, শুধু আশা নিরাশায় অপেক্ষা করে সকলে। লোক-সাংবাদিকতার এক গুরুদায়িত্ব পালন করেছে এই সময় লোককবিরা, এরা না থাকলে জনগণ প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে পারত না। যুদ্ধের প্রকৃত চিত্ররূপ তুলে ধরেছে এরাই, লোক-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে।

(১৩৪)

ননদ লো তোর বাই[১] গেল বৈদ্যাশে।
আর আইলোনা দ্যাশে।
চাটিগায়ের[২] রাঙা গো মাটি
তোর ভাইয়ের কাছে নেকচি চিডি[৩]। গুণের ননদ লো।
মেলেটারীতে[৪] যে জন চাখিরী করে
সে জন ক্যান বিয়া করে রে
গুণের ননদ লো তোর বাই গেল বৈদ্যাশে
আর আইলোনা দ্যাশে ॥

বিশ্বযুদ্ধের আরও একটি ভয়ানক অভিশাপ হল বাস্তু-উচ্ছেদ বা ইভ্যাকুয়েশন, অর্থাৎ বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার সরকারী আদেশ। সাধারণতঃ শহরের উপরেই আক্রমণের লক্ষ্য থাকে শত্রুপক্ষের, সেই কারণে যুদ্ধের সময় আলো নিভিয়ে 'ব্লাক-আউট' করা এবং চরম বিপদ আশঙ্কায় শহরের ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় সাধারণ মানুষের দেখা দেয় নানা সমস্যা—আর্থিক ক্ষতি তো আছেই। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত জেলা থেকে যেমন এই লোকাপসারণ হয়েছে তেমনি এই আদেশ জলপাইগুড়ি জেলাতেও দেওয়া হয়েছিল। ফলে সকলকে বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয় অন্যত্র। এর ফলে মানুষের অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, এই অসহায় অবস্থার কথাই লোক-কবিদের গানে ফুটে উঠেছে। ভাওয়াইয়া গানে এমনই এক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দার্থ : ১-ভাই, ২-চট্টগ্রামের, ৩-চিঠি লিখেছি, ৪-মিলিটারী অর্থাৎ সেনাবাহিনীতে।

(১৩৫)

শুন ও নগরবাসী ও—॥
জলপাইগুড়ি শহরত্[১] গাড়ীত নামিসে।
মাদারগঞ্জের বালুর টিপোত যায়া[২] মারেসে[৩] তোপ
শুন নগরবাসী ও ॥
মহারাজার হুকুমজারী না করেন বেলক[৪]
চট্ করিয়া না পালালে কইরবে জরিমানা
ঘরবাড়ী গেরস্তি সাজ তামানে[৫] ছাড়িয়ু
সগায় পালাচে হাতাসে[৬] মাইয়া ধরিয়া ॥

সমকালীন ঘটনা নিয়ে লোককবিরা অনেক গানই বেঁধেছেন। ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশভাগের ফলে যে চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তারই এক তথ্যচিত্র লোক-সঙ্গীতেও পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিশ্ব-যুদ্ধের ফল এবং উদ্বাস্তুদের অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে দিনযাপন—সব কিছুই ধরা পড়েছে লোক-কবির রচনায়। এমনই এক লোক-সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের 'ভাবেবোল' গানের আসরে।

(১৩৬)

পঁইতাল্লিশ সাল জীবনের কাল ডুবে গেল ধান।
হল তারপরে ক'বছর অন্তরে হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান ॥
ওগো পশ্চিম হতে এ জগতে উঠেছিল ঝড়
লোকে আস্তা[৭] হারা পাগলপারা জীবন শূন্য ধড় ॥
হাঙ্গামা দাঙ্গামা কত মামলা মোকদ্দমা
তাজা মানুষ হয় বেহুঁশ কইলকাতায় বুমা[৮] ॥
লোকে পাগল পারা প্রাণে মরা দেখে গুরার[৯] দল
পায়না দিশে ভাবে বসে আকাশ আর পাতাল ॥

শব্দার্থ: ১-শহরে, ২-গিয়ে, ৩-মেরেছে, ৪-ব্লাক বা কালোবাজারী, ৫-সবকিছুই, ৬-ভয়ে ৭-আস্থা বা বিশ্বাস রাখা, ৮-বোমা, ৯-গোরা বা ইংরেজ সেনা।

বড় দুঃখের কথা বলতে ব্যথা লাগে এসে বুকে
বাস্তুহারা ভিটে ছাড়া হয়্যাছে কত লোকে ॥
কেহ রাজা কেহ প্রজা কেউ পথের কাঙাল
গাছতলা তিনতলা যার যেমন কপাল ॥
পাগলরে মন কিসের কারণ ভাবছো অনিবার
একবার দেখো ভেবে কখন হবে দুনিয়া আন্ধার ॥
খাঁচা ছেড়ে যাবে উড়ে কখন খাঁচার পাখী
তাই করবোনা দেরী অল্পে সারি অল্প আছে বাকি ॥

লোক-সাংবাদিকতার এক করুণ কাহিনী কারবালার কান্নার ইতিহাস। লোকগীতি 'জারী' গানে এই কারবালার করুন কাহিনী গ্রামে গঞ্জে গেয়ে বেড়ায় লোককবিরা। জারী গানের আরবী অর্থ জারী বা জাহির করা হলেও এর ফারসী অর্থ ক্রন্দন। মূলতঃ মুসলমান সমাজে কারবালার ঘটনাবলী নিয়ে রচিত এই গানের সুর বিষাদে পূর্ণ। কারবালার কাহিনী নিয়ে রচিত গ্রন্থের নামও 'বিষাদ সিন্ধু'। এরই বিভিন্ন অংশ নিয়ে জারী গানের গায়কবৃন্দ পল্লীর ঘরে ঘরে এই বিষাদ সিন্ধুর নানা কাহিনী শোনায়। কারবালার শহীদ হোসেনের বীরত্ব গাথা এবং সাকিনার বিলাপ এই কাব্যের মূল অংশ। এই ঘটনার স্মরণেই মুসলমান সমাজে 'মহরমে'র জৌলুস বের হয় 'দুলদুল' নামের ঘোড়া সমেত। হোসেনের তৃষ্ণার্ত শিশু জলের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার করুণ অংশ ফুটে ওঠে পল্লী-কবির অশ্রুসজল চোখে আর বিষাদ-মাখা কণ্ঠে।

(১৩৭)

চাইনা পানি ওরে আকবর যাসনে বাপ ওই রণে।
ওই যেরে জল্লাদের ময়দান তুই গেলে বাপ ফিরবিনে[১] ॥
মাইরবে[২] শামসের ছুরি তোর ওই চন্দ্রবদনে
তুই নারে সোহাগের ময়না সহিবি তা কেমনে ॥
তোরে কি আর ফিরে পাবো আয়রে বাজান[৩] কোলে আয়
জন্মের মতন মা বলিয়া ডেকে যা তোর নিষ্ঠুর মায় ॥
কোন প্রাণে ধইর‌্যা বাবা তোরে রণে নিবেরে
কাইল আমারে এমন কইরে কে ডাইকবে[৪] মা বলে রে ॥

শব্দার্থ: ১-ফিরবি না, ২-মারবে, ৩-বাপজান—ছেলেকে আদর করে ডাকা, ৪-ডাকবে।

ইমাম হোসেনের তৃষ্ণার্ত শিশুপুত্র ফোরাত নদী তীরে এজিদের সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে জলের জন্য হাহাকার করতে করতে শত্রুর তিরে প্রাণ হারায়। নদীয়া জেলার জারী গানের শিল্পীগণ এই ঘটনাকে নিয়ে গান বাঁধেন এক করুণ বিষাদ সুরে। যেহেতু এগুলি লোকগীতি, তাই এর গীতিকারের নাম পাওয়া যায় না, তবে বামন পুকুর অঞ্চলে একজন জারীগানের গীতিকারের নাম পাওয়া যায়, তাঁর নাম মুন্সী মোহম্মদ মহছেনউল্লা। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে নদীয়ার হিন্দু লোক-গীতিকারের উপাধি যেমন সরকার, যেমন সাহেব-ধনী লোক সম্প্রদায়ের গীতিকার কুবির সরকার তেমনি মুসলমান গীতিকারের উপাধিও হয় মুন্সী।

জলের অভাবে তৃষ্ণার্ত-আকবরের মৃত্যুর ঘটনা জারী গানের অন্যতম করুণ অংশ। কারবালার কাহিনীর এই বিষাদপূর্ণ অংশের গান—

(১৩৮)

আকবর আলি কেঁদে বলে শোন বাজান পানি চাই
পানি বিনে আর বাঁচিনে দেল্[১] কল্জে[২] হল ছাই।
কেটেছি কাফের[৩] যত এ ময়দানে কেহ নাই
পানি বিনে মরি প্রাণে রণ হতে এলাম তাই॥
পোড়া পানি দেহ পিতে[৪] ফের যাব ঐ নিয়মে
খোদা চাহে ফতে[৫] করে বোছা[৬] দিব কদমে।
এমাম শাহা কাঁদিয়া বলে পানি পাবে জান্নাতে-
পরাণ ভরে পিও পানি মবিজীর নিজ হাতে॥

এই কারবালার কাহিনী নিয়ে আরও করুণ-গান গেয়েছেন লোকশিল্পীরা। গানের মধ্যেই ফুটে ওঠে কারবালা যুদ্ধের কাহিনী, কিভাবে সদ্য পরিণীতা স্ত্রীকে একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে অন্যহাতে স্বামীকে বিদায় জানাতে হয়। ঘোরতর সংগ্রাম চলছে কারবালা প্রান্তরে, একদিকে ইমাম হোসেন অন্যদিকে

শব্দার্থ: ১-দিল বা হৃদয, ২-কলিজা বা প্রাণ, ৩-অমুসলমান বা বিধর্মী। মূলতঃ কারবালার যুদ্ধ এক ধর্মযুদ্ধ, খলিফা পদ দখলের লড়াই, ৪-পান করতে, ৫-কর্মোদ্ধার করে, ৬-উৎসর্গ বা অর্ঘ্য।

দামাস্কাসের অধিপতি এজিদ। বিশাল মরুভূমিতে জলের চিহ্ন নেই কোথাও ফোরাত নদীর তীরে এজিদের সৈন্যদের কড়া পাহারা, একফোঁটা জল যেন না পায় হোসেনের যুদ্ধ শিবির। এই সময়েই হোসেনের কন্যা সাকিনার বিয়ে হল হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেমের সঙ্গে। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতেই কাসেম বিদায় চায় সাকিনার কাছে, দুয়ারে প্রস্তুত অশ্ব তাকে যুদ্ধে যেতে হবে এখনই। এই অবস্থার এক চমৎকার অথচ করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে লোক-শিল্পী দল তাদের জারী গানের মধ্যে।

(১৩৯)

সাকিনা : বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে ক্যান আকিঞ্চন
হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও না।
অনাথিনী কইর‍্যা মোরে বিয়ার বাসরে
কোন প্রাণে প্রাণনাথ চইল্যাছ সমরে।

কাসেম : ওহো হো মহা কর্তব্যের তরে ওরে ছাকিনা
চইল্যাছি এ ঘোর সমরে কাইন্দোনা কাইন্দোনা।

সাকিনা : যাইও না যাইওনা নাথ আমারে ছাড়িয়া
যদি যুদ্ধে যাইতে ছিল সাধ ক্যান কইরল্যা বিয়া।

কাসেম : পানি বিনা শিশুগণে ভুইগ্যা ভুইগ্যা মরে
ক্যামনে দেইখ্যা ইহা থাকিব শিবিরে।

সাকিনা : উদয় অস্ত একই সাথে কে দেইখ্যাছে কোথায়
বিয়ার ঘরে ইস্ত্রি রাইখ্যা সোয়ামী যুদ্ধে যায়।

কাসেম : রণে যদি না যাই প্রিয়া হাসরের দিনে
ক্যামনে দ্যাখাব মুখ বাজানের সামুনে।

সাকিনা : যাওহে বীরেন্দ্র কান্দে রাত্র মধ্যকালে
ডুবাও হে এজিদের নাম ফোরাতেরি জলে।

কাসেম : হয়তো আর দেখা হবে হাসরের দিনে
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালা নাহি গো যেখানে।

সাকিনা : তুমি যথা দাসী তথা জেনো গো নিচ্চয়
আসমুদ্র সীমাময় ঘোষিবে ধরায়।
হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও না॥

নব-পরিণীতা স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে কাসেম যুদ্ধে যায়, কিন্তু যুদ্ধে সে নিহত হল। ফিরে এল তার প্রিয় সাদা ঘোড়া, কাসেমের মৃতদেহ নিয়ে। শোকের বন্যা বয়ে যায় কাসেম ও সাকিনার পরিবারে, শোকে দিশেহারা সাকিনা কান্নায় ভেঙে পড়ে বিলাপ করে এক মর্মস্পর্শী ভাষায়। সাকিনার বিলাপের অংশ নিয়ে রচিত শোকগাথা লোক-শিল্পীরা তুলে নেয় তাঁদের কণ্ঠে, কারবালার অন্যায় যুদ্ধের কাহিনী প্রচারিত হয় দেশ দেশান্তরে। লোক-সাংবাদিকতার এই লোকগীতগুলি জনমানসে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে, হয় গণচেতনা বৃদ্ধি, লোকশিক্ষা। ইতিহাসের এই করুণ-কাহিনী সঙ্গীতের মধ্যে অমর হয়ে আছে। শোকাভিভূতা সাকিনা পাগলিনী-প্রায় হয়ে বিলাপ করে—

(১৪০)

হারে ও আমার প্রাণনাথ
এস এস এস প্রাণ হৃদি বাসরে।
কে রাঙিলো সোনার তনু গো
হায় হায় খুন খারাবী আবিহিরে[১] ॥
এস এস গো পিয়া এসেছি পাণ পিতিয়া
বুকে বিন্ধ্যা[২] বিষের চিত দেখহ লজরে[৩]।
হারে অঘোর ঘোরে ঘুম দিলোগো
সাকিনা লো তোর ঘরে ॥
এসো এসো ওগো বর
ধন্য আমার বাসর ঘর
আমিও লইব শয্যা তোমারি ধারে।
দাঁড়াও দাঁড়াও নাথ গো
আমি রক্ত চেলি লই পরে ॥
এস তবে প্রেয়সী চল বাসরে বসি
রক্ত জবার শয্যা পাতি গাঢ় তিমিরে।
নিবিড়ে ঘুমাবো দোঁহে গো
বাসি বিয়ার হাসরে ॥

শব্দার্থঃ ১-আবীরে, ২-বুকে বিঁধে, ৩-নজর করে বা ভাল করে চেয়ে দেখ।

ওকি এত সকালে সত্য সত্য ঘুমালে
চক্ষু চাইয়্যা ছাখো নাথ এই খঞ্জরে
আরে হানিছে মোর সুখ নিদ্রা গো
হায় হায় সাকিনা লো তোর ঘরে ॥

কারবালার প্রান্তরে দেশের জন্য জীবনদান করেছিল হাসান ও ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম এদের কাহিনী নিয়ে যেমন রচিত হয়েছে শোকগাথা তেমনি আর একজন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় ও তারপর বন্ধুপুত্র মীরণের হাতে প্রাণ বলিদানের ঘটনাও বাংলার লোকসঙ্গীত শিল্পীদের কাছে দীর্ঘদিন গানের বিষয় হিসাবে গৃহীত ছিল। লোকসাংবাদিকতার যে অন্যতম দায়িত্ব ইতিহাসের ঘটনাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা, বাংলার লোকশিল্পীগণ এই দায়িত্ব পালনে পশ্চাদপস্থত হয়নি কখনও। তারা আপামর জনগণের কাছে বাংলার ভাগ্যাকাশে বৃটিশ সূর্যোদয়ের ইতিহাসের পশ্চাদপট সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে লোকসঙ্গীতের দ্বারা।

(১৪১)

কি হলরে জান— ।
পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
তির পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে
একলা মীরমদন বল কত লবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লালকুর্তি গায়
হাঁটু গেড়ে মারছে তির মীরমদনের গায়
হি হলরে জান—
পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরাণ ॥
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী
কইলকাতায় বইসে কান্দে মোহনলালের বেটি
কি হলরে জান—
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানীর নিশান ॥
ফুলবাগে ম'ল নবাব খোসবাগে মাটি
চান্দোয়া টাঙায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি
কি হলরে জান—
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানীর নিশান ॥

লোক-সাংবাদিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জনসমক্ষে প্রচার করা। ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী'র মামলায় রাজপুরীর কূটচক্রের রূপ প্রকাশিত হয়, লোককবি এই ঘটনাই জনসমক্ষে প্রচার করেন। তৎকালীন সময়ে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা সারাদেশে আলোড়ন তুলেছিল, জনগণ ঘৃণার আগুনে ভস্ম করেছিলেন তৎকালীন রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রীদের। কি ভাবে তাঁরই বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী এবং বন্ধু আশু ডাক্তারের উদ্যোগে জীবন সংশয় করে তুলেছিল ভাওয়ালের রাজা মধ্যম কুমারের সেই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় এই লোকসঙ্গীতে। পূর্ববঙ্গের ঢাকা-জেলার জয়দেবপুরের রাজবাড়ীর এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী লোক-কবিগণ গ্রামে গঞ্জে প্রচার করেছেন। মূলতঃ হিন্দু বয়াতীদের গানেই এই ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রথম প্রকাশ পায়, পরবর্তী সময়ে অন্যান্য লোক-শিল্পীদের কণ্ঠেও এই সঙ্গীত প্রচারিত হতে থাকে।

(১৪২)

এই সবা[১] কইর‍্যা বইছেন[২] যত হিন্দু মোছলমান
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর পরাস্তব[৩] করেন প্রণিধান ॥
ধন্য ধন্য রাজন বিষে পেলে জীবন
দুষ্টানারী নষ্ট কইরলো সোনার সিংহাসন ॥
ছিল ঢাকা জিলায় জয়দেবপুরে মেজকুমার রাজ্য ভাণ্ডারে
নামটি হল রমেন্দ্র নারায়ণ।
বিবাহ করিয়া তিনি ঘরে আইনলেন[৪] কাল সাপিনী
এতদিনে রাজধানী হইল শ্মশান ॥
ছিল রাণী এমনি কঠিন হিয়া বলে আশু ডাক্তারকে ডাকিয়া
তুমি কি করিতে পার রাজারে নিধন ?
ডাক্তার বলে পারি আমি আমার যদি হও তুমি
রাণী বলে এখনি মিলিব দুজন ॥
ডাক্তার ভাবে মনে মনে রাজাকে মারবো কোন্ সন্ধানে
বিষ দিয়া বধিব জীবনে যা করেন ভগবান।

শব্দার্থ : ১-সভা, ২-বসেছেন, ৩-প্রস্তাব বা কাহিনী, ৪-আনলেন।

ডাক্তার এই কথা বলিল ভাওয়ালেরে কালে ঘিরিল
ওদিকে শোনেন কিছু রাজার বিবরণ।
বিধির কি লীলা হল মহারাজের অসুখ হল
মহারাজ বলে এ ব্যারামে[১] যাইবে জীবন ॥
শুন বন্ধু আশু ডাক্তার এ ব্যারামের কর প্রতিকার
ডাক্তার বলে এখনি চল দার্জিলিং।
দার্জিলিং এর হাওয়া ভাল যাবে ব্যারাম রবে ভাল
থাকবে এ দেহ শীতল হবেনা মরণ ॥
মহারাজ বলে যাবো আমি সঙ্গে যাবে রাজরাণী
শালা বাবু যাবে আর মুকুন্দ গুন।
রাজার ছিল জ্বরের ব্যারাম দার্জিলিং যায় হতে আরাম
বন্ধু আশু ডাক্তার সঙ্গে গেল ব্যবস্থার কারণ ॥
দার্জিলিং গেল পরে রাণী বলে ডাক্তার রে
ঔষধে বিষ মিশায়ে দাওনা এখন।
ঔষধে বিষ মিশালো মহারাজকে খেতে দিল
খেয়ে রাজা অস্থির হল ঘোর হল নয়ন ॥
মহারাজ বলে আর বাঁচলাম না এ সময়কালে কোথায় র'ল[২] মা
আর বুঝি দেখলাম না বন্ধু বান্ধবগণ।
থর থর কাঁপে অঙ্গ রাজার ভবের খেলা হল সাঙ্গ
কোথা রইলে ত্রিভঙ্গ দাওহে দরশন ॥
তুমি হও অগতির গতি তুমি হও মোর সাথের সাথী
এই বলিয়া রাজা মুদিল নয়ন।
রাণীর স্বার্থের বন্ধু যারা তারা বলে গেল মারা
রাণী বলে সবে কর সৎকারের আয়োজন ॥
বলি আমি সবাকারে আসো সবে সৎকার করে
পুরস্কার দিব আমি খুশি করে মন।
রাজার অন্নে বাঁচতো যারা লকড়ি[৩] কাষ্ঠ আনে তারা
রাজাকে শ্মশানে দিয়ে জ্বালিল আগুন।

শব্দার্থ : ১-অসুখে, ২-রইল-সংক্ষেপিত, ৩-কাঠ।

বিধির কী লীলা হইল ঝড়বৃষ্টি আইসে পইরলো[1]
রাজাকে শ্মশানে রেখে করে পলায়ন।
ঐ জঙ্গলে ছিল সাধু মুখের বাকে[2] ছিল মধু
নাগা বাবা ধর্মদাস ছিল তাঁর নাম।
ধ্যানে পেল সমাচার এ ভাওয়াল মধ্যম কুমার
দার্জিলিং পাহাড়ে এসে হয়েছে মরণ॥
সাধু ত্যাখে ক'রে ধ্যান মরে নাই রাজা অজ্ঞান
ঔষধ দিয়া রাজায় পাইল জীবন।
মহারাজ বলে সাধুরে এখনি বল আমারে
কোথায় আমার রাজরাণী বন্ধুবান্ধবগণ॥
সাধু বলে শুন রাজন বুঝাইবো সব বিবরণ
এক্ষণে রাজা তোমার হয়েছিল মরণ।
মহারাজ বলে সাধুরে আর যাবো না জয়দেবপুরে
কার বা রাণী কার বা পুরী কিসের সিংহাসন॥
সাধু বলে থাকো তুমি ভেবে সেই জগৎস্বামী
কিবা কইরবেন[3] রাজরাণী আর দুষ্টাগণ।
বলরাম দাস পড়ে কাঁদে দিবা নিশি শুধু কাঁদে
আনন্দে রেখো মোরে ওহে ভক্তগণ॥
থাকে আশ্রমেতে কোন মতে বারটি বৎসর
সেবাকার্যে রত থাকে ভাওয়ালের ঈশ্বর। তারা কেউ পায়না দিশে।
তারা কেউ পায়না দিশে, লোকের কাছে বলে ঘরে ঘর
মধ্যম কুমার মারা গেল দার্জিলিং শহর। হল শ্রাদ্ধ শান্তি।
হল শ্রাদ্ধ শান্তি, মনের ভ্রান্তি অশান্তি অপার
ডাক্তার বাবু আর মহারাণীর শান্তি চমৎকার। আনন্দের সীমা নাই।
আনন্দের সীমা নাই, বইলবো কি ভাই গেল বার বৎসর
ইহার পরে উদয় হইল ঢাকারই শহর। থাকে সদর-ঘাটে।
থাকে সদরঘাটে, নিষ্কণ্টকে চিনিতে না পারে
কতকদিন পরে তিনি যান কাশীমপুরে। থাকেন বন্ধুর বাড়ী।

শব্দার্থ: ১-পড়লো, ২-কথায়, ৩-করবেন বা করতে পারবেন।

থাকেন বন্ধুর বাড়ী, দিন দুই চারি ব্যাপ্ত চরাচরে
তারপর যান তিনি রাজ্য জয়দেবপুরে। প্রথম মাধব বাড়ী।
প্রথম মাধব বাড়ী, সারি সারি করেন নমস্কার
তা দেখে সব পাড়ার লোকে হলেন চমৎকার। গিয়ে শ্মশান ঘাটে।
গিয়ে শ্মশান ঘাটে, বসে এঁটে নবীন যোগীবর
জ্যোতির্ময়ী জিজ্ঞাস করে কোথায় তোমার ঘর। তখন মধ্যম কুমার।
তখন মধ্যম-কুমার, কয় সমাচার কী জানি আর
মাতা পিতা ভাই বন্ধু কেহ নাই আমার। তখন সর্বলোকে।
তখন সর্বলোকে, মনের সুখে বলে বার বার
বর্তমানে চিহ্ন আছে মধ্যম কুমার। উঠলো রব চতুঃপার্শ্বে।
উঠলো রব চতুঃপার্শ্বে, দেশ বিদেশে বলছে সমাচার
মধ্যম কুমার দেশে এল জগতে প্রচার। তখন বহু লোকে।
তখন বহুলোকে, মনের সুখে এলেন জয়দেবপুর
এক ট্যাকা স্যার[১] চিড়া খায় দশ আনা স্যার গুড়। তখন আশু বলে।
তখন আশু বলে, কৌতূহলে ভাই মুকুন্দ শুন
এতদিনে জ্বলে উঠলো পাপেরই আগুন। মুকুন্দের জীবন হারা।
মুকুন্দের জীবনহারা, গেল মারা মনীন্দ্রেরই হাতে
আশুবাবুর বাত ব্যাধি পিত্ত শূল তাহাতে। এসব কালের চক্র।
এসব কালের চক্র, হল বক্র বলরামে কয়
শালার ভাইগ্যে[২] রাণীর ভাইগ্যে কি জানি কী হয়। মনে এত বিষাদ।
মনে এত বিষাদ, তাই ধন্যবাদ তবু তোমায় দেই
তোমার মত এমন খেলা খেলতে অন্য নাই। থাকিত বনমাঝে।
থাকিত বনমাঝে, গুরুর কাছে গুরুর সত্য নাম
গুরু পদে প্রাণ সঁপিয়ে পূর্ণ মনস্কাম। এখন আর নাই শঙ্কা।
এখন আর নাই শঙ্কা, নামের ডঙ্কা বেজে উঠল ভাই
জয়দেবপুরে উদয় হইল ভাওয়ালের গোঁসাই। আসিয়া প্রজালোকে।
আসিয়া প্রজালোকে, মনের সুখে পেল দরশন
মরা দেহে জীবন পেল ভাওয়ালবাসীগণ। বলে মেঝকুমার[৩]।

শব্দার্থ : ১-সের, ২-ভাগ্যে, ৩-মধ্যমকুমার।

বলে মেঝো-কুমার আন আমার নিকাশেরই জমা
ত্বরায় করে করে দিল সত্যের মোকদ্দমা। একখানা রূপার গাড়ী।
একখানা রূপার গাড়ী, মরি মরি অতি চমৎকার
হাতী ঘোড়া কত ছিল সংখ্যা নাইকো তার। বাড়ীতে চিড়িয়াখানা।
বাড়ীতে চিড়িয়াখানা, গেল জানা পশুপক্ষীগণ
বাঘের সঙ্গে প্রতি দিনে খেলিতাম যখন। করিতাম কুস্তি খেলা।
করিতাম কুস্তি খেলা, সকাল বেলা বিদি[১] বাদী হল
লোহাগাড়া বাঘে যখন খাম্‌চে মেরেছিল। তাহার চিহ্ন আছে।
তাহার চিহ্ন আছে, হাতের কাছে অনেক চিহ্ন গায়
গাড়ীর চাকায় পায়ে চিহ্ন আর দন্ত ভাঙ্গা যায়। কুমারের হাতের লেখা।
কুমারের হাতের লেখা, স্পষ্ট দেখা পেল পরিচয়
রাণীর অঙ্গের চিহ্ন কিছু মেঝোকুমারে কয়। আছে তার চোখের কোঠায়।
আছে তার চোখের কোঠায়, গোটা গোটা অল্প ডাবায়
পায়ে একটি আঙ্গুল খাটো দেখিবেন নিশ্চয়ই। একটি গুপ্ত-চিহ্ন।
একটি গুপ্ত চিহ্ন, লজ্জা শূন্য বলে কী আর কাজ
সবার নিকট বলতে আমার বড় লাগে লাজ। শুনিয়া পতির বাণী,
শুনিয়া পতির বাণী, সতীরাণী (!) জবানবন্দী করে
চিহ্ন তালাস করবে বলে সদাই কাঁপে ডরে। হুজুর কয় কোঠায় নিয়া,
হুজুর কয় কোঠায় নিয়া, দেখ গিয়া করিয়া বিস্তার[২]
গুপ্ত-চিহ্ন আছে নাকি বল সমাচার। হুজুর কয় শোন রাণী।
হুজুর কয় শোন রাণী, আমার বাণী চিনিতে পার কি
রাণী কয় আছে জানা চিনাশুনা আর জানিব কী। যখন চন্দন কাঠে,
যখন চন্দন কাঠে, চিতা সাজায় ঘৃত মেখে গায়
শ্মশানে তুলিয়া যখন আগুনে পোড়ায়। আমি সেই গাছের তলে,
আমি সেই গাছের তলে, চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যাই
মধ্যম কুমার পুড়ে যখন হয়ে গেল ছাই। হুজুর কন সাক্ষী মান,
হুজুর কন সাক্ষী মান, শীঘ্র আনো বুঝিনা মহিমা
আসামী ফরিয়াদীর কথায় হয়না মোকদ্দমা। রাণী কয় বিপদ ভারী,

শব্দার্থ: ১-বিধি বা বিধাতা, ২-খুঁজে দেখ।

রাণী কয় বিপদ ভারী, মরি মরি করি কী উপায়
জাজ্বল্যমান মিথ্যা সাক্ষী কোথায় গ্যালে পাই। আশু কয় ভাবছো ক্যান
আশু কয় ভাবছো ক্যান, কথা মান আমার কথা লও
মিথ্যাবাদী মানুষ যারা তাদের এনে দাও। খুঁজিয়া ঘরে ঘরে।
খুঁজিয়া ঘরে ঘরে, টাকার জোরে আনলো কয়েকজন
না জানিয়া কী বলিবে ভাবিছে তখন। দাঁড়িয়ে টিকটিকিতে,
দাঁড়িয়ে টিকটিকিতে, সাক্ষী দিতে ভয়ে কাঁপে প্রাণ
মিথ্যা প্রমাণ দিতে কত হল অপমান। হুজুর কন বিচার হল,
হুজুর কন বিচার হল, রাণী পেল ভাতা দেড়শো টাকা
রাজায় সম্পত্তি পেলো আর সকলে ফাঁকা। কবিতা সাঙ্গ হল,
কবিতা সাঙ্গ হল, বল নমস্কার জানাই।
শেষের দিনে হরি বিনে বন্ধু কেহ নাই॥

সমকালীন ঘটনাবলী নিয়ে লোক-কবিদের রয়েছে নানা গান। ভাদু গানেও সমকালীন ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্য-মন্ত্রীত্বের কালে কলকাতা শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ কমাতে দ্বিতীয় শহর হিসাবে কল্যাণীকে বাছা হয় এবং সেখানে নগর পত্তন করেন বিধানচন্দ্র রায়। সেই ঘটনার প্রতিফলন লোকসঙ্গীতেও রয়েছে—

(১৪৩)

শুন নতুন খবর।
কল্যাণীতে ঘটিল যা এ বৎসর
বিরাট কীর্তি বিধান রায়ের গো
আমাদের সে মন্ত্রীবর।
বন কেটে নগর বসালো
করিল নূতন শহর।
কলিকাতা কোথাতে ঠেকে গো
হোক যা যত মনোহর।
তারও সেবা করবে জানি
হাল ফ্যাসানী নূতন ঘর॥

ঢ. আধুনিকতার গান

মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য আচার ব্যবহারকেই আধুনিকতা বলে কটাক্ষ করা হয়েছে, তবে নাগরিক জীবনযাত্রার চালচলনকেও অনেক সময় গ্রামের মানুষ বিরূপ সমালোচনা করেছে, কারণ নাগরিক জীবনের চালচলন গ্রামীণ জীবন ছন্দের সঙ্গে খাপ খায় না, সেক্ষেত্রে যারা নাগরিক জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদের সাধারণের চোখে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। স্বভাবতই যে জীবনযাত্রা গ্রামীণ জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে সমর্থন করে এবং বিপরীত অবস্থার সমালোচনা করে লোককবিরা গান বেঁধেছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিদেশে চলে যায় চাকরীর সন্ধানে ফলে দেশে বাবা মাকে ফেলে যায় অনাদৃত অবস্থায় এবং প্রবাসে স্ত্রীর পরামর্শে কাজকর্ম করে এই অভিযোগ নিয়ে আধুনিক প্রজন্মের প্রতি শ্লেষাত্মক রচনায় পূর্ণ হয়েছে লোকসঙ্গীতগুলি। মানভূম অঞ্চলের লোককবি তাই ক্ষোভের সঙ্গে গান করেন—

(১৪৪)

শুন শুন বন্ধুগণ মোর এই নিবেদন
কলিযুগের মাহিত্বম্।
যিনি হন মাতা পিতা তাহার না মানে কথা
মহামায়ার মাহিত্বম্।
ভাই বন্ধু পরিহারি যায় তারা দেশ ছাড়ি
জন্মদাতা চিনেনা তখন।
যার উদরে জন্ম নিল তখন তারে না চিনিল
নারীর কথায় চলেন॥

আধুনিকা নারী সম্পর্কে সাধারণের মনে সবসময়েই খানিকটা অবজ্ঞা থাকে, এদের চালচলন ও কথাবার্তা কোনটাই প্রাচীনপন্থী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, ফলে 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' বলে নানা রকম খুঁত-ধরা

হয়, অন্যদিকে আধুনিকা নারী সাজতে গিয়ে অনেকেই হয়তো বাড়াবাড়ি পর্যায়ের অনুকরণপ্রিয় হয়ে পড়েন, স্বভাবতই সাধারণ সমাজে এগুলি সৃষ্টি করে নানা শ্লেষ ও ব্যঙ্গাত্মক আলোচনার। আধুনিকা নারীর স্বরূপ সম্পর্কে লোক-সঙ্গীতে এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের চিত্রকল্পে নারীকে সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পালনেরই নির্দেশ থাকে লোক-কবিদের গানেও।

(১৪৫)

যুবো নারীর মুখে গুয়া পান।
কলির ভাব দেইখ্যা বাঁচে না পরাণ॥
এরে আঁখঠারে[১] কথা বলে, পতিক মারে নয়ান বাণ॥
(বলে) পাছা পাইর‍্যা কাপুড় দ্যাও একখান
চোখে কাজল দাঁতে মিশি, লও পতি জুড়াও পরাণ।
এরে ঘাটে লষ্ট[২] পাটে লষ্ট হয়
আবার ধোবার ঘরে কাপুড় লষ্ট হয়
আঙ্গুল দিলে ঘৃত লষ্ট হয়, এরে বাইন্দা বেড়ায়।
সেই যে নারী সতী থাকে ভাই
কেবল দিনা চার পাঁচ ছয়
এরে গোল খাড়ু মাল গুরজি[৩] লয়া পায়।
সোনার ধান তাবিজে শোবা হয়
গোল খাড়ু মাল গুরজি লয়া পায়॥
এরে মাজাখানি[৪] হেলে দুলে
যমুনার জল আনতে যায়
তাই দেখিয়া দুষ্টেরা সব কয়
ধন্য ধন্য তোমার সোয়ামি গড়ন[৫] দিচ্ছে সারা গায়॥

গ্রাম জীবনের একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে নবীন প্রজন্মের নারী শহরের চাকচিক্যের প্রলোভনে পড়ে শহরে থাকতে চায়। তাদের এই কামনা পূরণ করা যেমন অসম্ভব তেমনি তাদের আবদারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে

শব্দার্থ : ১-চোখের ঈশারায়, ২-নষ্ট, ৩-পায়ে দেওয়ার গহনা, ৪-মাজা বা কোমর, ৫-শরীরে রূপ ফুটে উঠেছে (গড়িয়ে পড়ছে)।

তাদের আপনজন বিশেষতঃ স্বামী বেচারা। এমনি এক কৌতুককর ছবি এঁকেছে লোককবি উত্তরবঙ্গের চট্‌কা লোকসঙ্গীতের মধ্যে। নাগরিক জীবনের কৌতুককর অবস্থায় যাতে আর কেউ প্রলুব্ধ না হয়, সেজন্য লোককবিদের এই ধরনের গানের প্রচার। গণচেতনা বৃদ্ধিতে ও লোকশিক্ষায় লোক-কবিদের রয়েছে অনবদ্য অবদান। তারই নমুনা হিসাবে লোকগীত—

(১৪৬)

আমার বাঙলায় করে মোন ফাপর[১] চল্ যাই কইলকাত্তা শ'র[২]।
শ'রে ভাড়া কইরলাম ঘর, থাকি দোত্‌লার উফর[৩]
দিনে দিনে গিন্নীর মোন করে ফর ফর॥
গিন্নী গাড়ী বাড়ী দৌড়িবার[৪] চায়, থাকতে চায় দিল্লীর শ'র
আইসে এই কইলকাত্তা শ'র।
গিন্নী আলতা পরে পায়, পায়ে ছ্যাণ্ডেল[৫] নাগায়
চউখে চশমা হাতে হাতঘড়ি খ্যায়॥
গিন্নীর ভ্যানিটি ব্যাগ সোনার গয়না গায়
গিন্নী বাইনতে[৬] বলে নেকে[৭] ঘর।
ভেইবে মুকুন্দ বলে মোনের আক্ষেপ গিন্নীর আছে সকলে
সোয়ামীর কোলাত্ দিয়া ছাওয়া[৮] গিন্নী আস্তায়[৯] চলে।
ও তার ডুরে শাড়ী রেশমী চুড়ি তবু আমায় ভাবে পর
এইসে এই কইলকাত্তা শ'র॥

আধুনিকা নারীর আরও নানা রূপ ধরা পড়ে লোককবিদের চোখে। তারা সবই লক্ষ্য করে আর এই আধুনিকতার চিত্র তুলে নেয় আপন মনের পটে, পরবর্তী সময়ে এইসব ছবিই গান হয়ে প্রকাশ পায় লোক সমাজে। আধুনিকা নারীর অঙ্গ-ভঙ্গি চাল-চলন সবকিছুই যেন বিসদৃশ, সব কিছুতেই যৌবনের হাতছানি এই অবস্থার চিত্র তুলে ধরে সাবধান করে দেয় জনগণকে, কারণ এইসব আধুনিকাদের 'খ্যাকলে রসিক ঠিক থাকে না, পাগল হয় বুড়া'—

শব্দার্থ: ১-ছটফট করা, ২-শহর, ৩-উপর, ৪-চড়তে বা চালাতে, ৫-স্যাণ্ডেল, ৬-বাঁধতে, ৭-লেক অঞ্চলে, ৮-ছেলে, ৯-রাস্তায়।

লোকসাংবাদিকতার এই অনন্য-সাধারণ দায়িত্ব পালন করা লোককবিদের অন্যতম দায়িত্ব। উল্লিখিত শ্লেষ-পূর্ণ ছবিটি তাই গণচেতনার অপরূপ নিদর্শন।

(১৪৭)

পায়ে আলতা পরা।
পায়ে আলতা পরা, যায়না চাওয়া চটি জুতা পায়
হেলিয়া ঢুলিয়া পড়ে যৌবন জ্বালায়। বাহুতে চেইন অনন্ত[১]।
বাহুতে চেইন অনন্ত, দ্যাকতে শান্ত কোমরে চেইন দিয়া
হাইট্যা গেইলে দ্যাকায় য্যামোন পড়ে বুজি ভাঙ্গিয়া॥
পিনছে[২] মিহিশাড়ী।
পিনছে মিহিশাড়ী, পাছা পাইরে ঝিলিমিলি করে
আঁচলে ছোরানি[৩] বান্দা ঝুনুর ঝুনুর করে॥
মাথায় কালো ক্যাশ—
মাথায় কালো ক্যাশ দ্যাকতে বেশ ভুরু কপাল জোড়া
দ্যাকলে রসিক ঠিক থাকেনা, পাগল হয় বুড়্যা॥

লোকসাংবাদিকতার অন্যতম দায়িত্ব সামাজিক পরিবর্তনের ছবি তুলে ধরা। আধুনিক হওয়ার বাসনায় কিভাবে সমাজে অবক্ষয় নেমে আসে বা সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসে তারই চিত্ররূপ ফুটে ওঠে লোকসঙ্গীতেও। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় কোচ পলিয়া প্রভৃতি জাতির নারীদের কাছে নাগরিক সভ্যতার জৌলুষ আকর্ষণীয় মনে হয়, তারা সেই জীবনের স্বাদ পেতে চায়, সাধারণ জীবনযাত্রায় আর তারা আগ্রহী নয়, এই অবস্থার চিত্ররূপই প্রকাশ পেয়েছে একটি গম্ভীরা গানে।

(১৪৮)

মোক্ আনি দ্যাও গুলবাহার
ধোকরা[৪] 'মেকলী' পরবোনা মুই আর।
অংবিঅংয়ের[৫] চুড়ি হাতোত্ দিয়া, বেরামো রঙবাহার॥

শব্দার্থ : ১-হাতে পরার অলঙ্কার বিশেষ, ২-পরেছে, ৩-চাবির রিং, ৪-রাজবংশী মেয়েদের পোষাক, ৫-নানা রঙের।

বিবিয়ানা পেইকি গায় দিয়া
সাদ হয়্যাচে[১] সাজিবুঁ মুই শহর্যা মায়্যা[২]।
কুটুম না মুই মিহি চিড়া দিমুনা ঢেকিত্ পাড়
ভদ্দরনোকে বোকে[৩] কহেন 'গো'[৪]
মোকে আর 'তানি'[৫] কহবেন
কুঠে যাহেন গো।
ঘরে বইস্যা থাকুম না মুই
বেড়্যাত্ যামু তিন পাহাড় ॥

গণ-মাধ্যমের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে লোক-মাধ্যম সমাজ চেতনা-বোধের কাল থেকেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে জনগণের সঙ্গে সঙ্গে। লোক-মাধ্যমের অন্যতম পর্যায় লোকসঙ্গীতের কার্যকারিতা এর মধ্যে অনেক বেশি, কারণ একক ব্যক্তি প্রয়াসে এই মাধ্যমের প্রয়োগ করা যায় এবং প্রয়োজনমত এর-নিত্য-নতুন সৃষ্টিও সম্ভব। লোক-মাধ্যমের অন্যান্য পর্যায়, যেমন লোকনৃত্য ও লোকনাট্যের এই সুবিধা নেই, শেষোক্ত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমগুলির প্রয়োগের জন্য দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও একাধিক জনের সহায়তা প্রয়োজন হয়, সেই তুলনায় লোকসঙ্গীত অনেক সহজ, দ্রুতগতি ও স্বল্প-আয়াস যুক্ত। একটি একতারা বা দোতারা কিংবা গুবগুবি নিয়েই লোকসঙ্গীত শিল্পী তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন জনসমাজের কাছে, এবং এই সাধারণ যন্ত্রের প্রয়োগই মানুষের মনে গভীর দাগ কেটে যায়।

গণ-সংযোগের প্রয়োজনে এই লোক-মাধ্যমের প্রয়োগ তাই বর্তমানে ক্রম-বর্ধমান। এমন কি বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও এই লোক-মাধ্যমের 'ফর্মের' ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠায়, আকাশবাণী ও দূরদর্শন তথা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান প্রচারকগণও এই লোক-মাধ্যমের ধাঁচে অনুষ্ঠান করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। গণসংযোগের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে প্রথাসিদ্ধ বা লৌকিক গণ-মাধ্যম কিংবা লোকমাধ্যমের গুরুত্ব আজ অনস্বীকার্য। আর এই লোকমাধ্যমের অন্যতম কাজই হল লোকসাংবাদিকতা।

শব্দার্থ: ১-সাধ হয়েছে বা ইচ্ছে হয়েছে, ২-শহরের মেয়ে বা আধুনিক মেয়ে, ৩-বৌকে বা স্ত্রীকে, ৪-আধুনিক ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীকে 'ওগো' বলে সম্বোধন করেন, ৫-তিনি অর্থাৎ স্বামীও স্ত্রীকে বলবেন 'কোথায় যাচ্ছো গো'।

সাংবাদিকরা সব সময় যে কথা লোক সমক্ষে প্রচার করতে পারেন না, লোক-সাংবাদিক তথা লোকশিল্পীবৃন্দ সেই ঘটনা বা সংবাদ খুব সহজেই সাধারণের গোচরে আনতে পারেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে লোক-সাংবাদিকতার ব্যাপকতা অনেক বেশি। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে সংবাদ লোককবিগণ প্রচার করেন তার গ্রহণযোগ্যতা যেমন বেশি, তেমনি তার বিশ্বাসযোগ্যতাও অনেক বেশি। অনেক সংবাদপত্রের সংবাদ নিয়েই সাধারণের মনে সংশয় থাকে, কিন্তু নিজের চোখে দেখা বা কানে শোনা কথা যে লোককবি জনগণের সামনে তুলে ধরেন, তা স্বাভাবিকভাবেই সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদের প্রতিও জনগণের সম্পূর্ণ আস্থা থাকেনা কারণ একে তো তা সরকারী মাধ্যম বলে, দ্বিতীয়ত তার সাংবাদিকেরা সর্বত্রগামী হতে পারেন না। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সংবাদের সত্যতা নিয়ে সংশয় থাকেই কারণ সাধারণের ধারণা এগুলি সরকারী সংস্থা তথা সরকারী প্রচার সংস্থা; উপরন্তু যেসব ব্যক্তি-মালিকানার বৈদ্যুতিন মাধ্যম রয়েছে সেগুলির প্রচারিত সংবাদও একপেশে বা পক্ষপাতমূলক বলে তার বিশ্বাসযোগ্যতাও যথাযথ নয়। ফলে একমাত্র নিজেদের 'ঘরের লোক' লোকশিল্পীগণ যে সংবাদ পরিবেশন করেন, তার মর্যাদা অনেক বেশি, সেই কারণে 'লোকসাংবাদিকতা'র গুরুত্বও যেমন বেশি, জনগণের উপর তার প্রভাবও অনস্বীকার্য।

লোকসঙ্গীতের বিভাগ বিন্যাস

[লোক-সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সঙ্কলিত সঙ্গীতসমূহের বিষয়-ভিত্তিক বিভাজন]